ধর্ম্মতত্ত্ববারিধি।



শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্মতত্ত্ব-বারিধি।

করালীচরণ চক্রবর্ত্তী



কলিকাতা

১৪নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, "লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌"

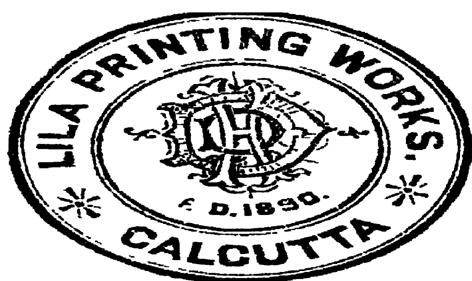
যন্ত্রে শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত,

এবং এথোড়া—সীতারামপুর হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২[illegible] সাল।

মূল্য ।।৵০ আনা মাত্র।


LILA PRINTING WORKS,
A D. 1890.
CALCUTTA

ওঁ দুর্গা শরণং।

উৎসর্গ-পত্র।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় ৺অম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মণঃ

পিতৃদেবস্য শ্রীচরণকমলেষু—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতৃদেব!

সংসার-মোহে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া এ অধম শ্রীচরণের সেবা করিতে অবকাশ পায় নাই। সেই চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাবলম্বনই অস্থির মনের স্থিরতা সম্পাদনের প্রধান উপায়। সেইজন্য ঋষি-প্রণোদিত সনাতন নিয়মের উপর চিরন্তন ধারণা দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে প্রত্যক্ষ দেবতার কৃপায় সংসারক্ষেত্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, সেই পরব্রহ্মরূপী পিতৃদেবের শ্রীচরণে সতত যুক্ত থাকিয়া, এ অধমের অনিত্য পৌরুষেয় জ্ঞান সত্তেও সেই নিত্য-জ্ঞানপ্রসূত সর্ব্বধর্ম্মের প্রসূতিস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মমূলক এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া, সেই পরমারাধ্য শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলাম।

এথোড়া—সীতারামপুর।

দীন হীন সন্তান,
শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন।

এই পাপতাপ-কলুষিত কলিযুগে হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে নূতন কিছু বলিবার বাসনা মাদৃশ হীনজনের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ বহু বহু আর্য্য ঋষিগণ কর্তৃক যে সকল তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন নূতন করিয়া কিছু বলিবার শক্তি বা সামর্থ্য কোথায়? সামান্য শিক্ষায় স্বীয় অনুভবলব্ধ নূতন প্রথায় বা নূতন কথায় এ ধর্ম্মের আলোচনা কেহ কখনও করেন নাই বা করিতে পারিবেন না। সেই শাশ্বতধর্ম্ম, যাহা নিত্যজ্ঞানপ্রসূত, তাহা কখন এ অধমের অনিত্য পৌরুষেয় সামান্য বিদ্যার দ্বারা আলোচিত হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞানী, ধর্ম্মের উপর চিরন্তন বিশ্বাস ও প্রকৃত অধ্যবসায় দ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারিয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণের দ্বারা যাহা সর্ব্বধর্ম্মপ্রসূতিস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ সমূহের যথাসাধ্য সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তির উপর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে।

অল্প-বাগ্বিভব-শক্তি আমি যে বিষয় চিত্তে পরিপোষণ করিয়াছি, তাহার গূঢ় অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে বা বুঝাইতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। সেইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, উপনিষদ স্বরূপ গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, তন্ত্র ইত্যাদির মর্ম্মানুবাদ অনেক যশস্বী মনীষীদিগের কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি; তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পঞ্চকোট-মহারাজের মহামান্য সভাপণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকণ্ঠ, মান্যবর উদারচেতা সাহিত্যসেবী ঐতিহাসিক-বিশারদ শ্রীযুক্ত-নিখিলনাথ রায়, বি, এল, ও স্বনামধন্য "দৈনিক চন্দ্রিকা" ও "হিন্দুস্থানের"

সুযোগ্য সম্পাদক বিদ্বদ্‌প্রবর শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত কবিভূষণ মহাশয়গণ কৃপা করিয়া আমার পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

নানাকার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত অনেক স্থানে মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ অনিবার্য্য-রূপে রহিয়া গেল ; তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনের বাসনা রহিল।

এথোড়া, সীতারামপুর,
বর্দ্ধমান।
২রা আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

একান্ত বিনয়াবনত,
শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী।

সূচীপত্র।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে এই পুস্তকের প্রণয়নে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। (মাননীয় পাত্র মহাশয় ও পূজনীয় বঙ্কিম বাবু দ্বারা ব্যাখ্যাত।)
২। শান্তি গীতা ও ভগবতী গীতা।
৩। শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলী।
৪। যোগবাশিষ্ঠ (পূজনীয় পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা অনুবাদিত।)
৫। যোগতত্ত্ববারিধি।
৬। হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্ম।
৭। হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।
৮। সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা।
৯। ভক্তিসাধন।
১০। কাঠোপনিষদ।
১১। মনুসংহিতা।
১২। তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ।
১৩। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ।
১৪। ঐ ভক্তিযোগ।
১৫। ঐ রাজযোগ।
১৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।
১৭। উৎসব পত্রিকা।
১৮। ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকা।
১৯। ত্রিশূল পত্রিকা, ইত্যাদি।

শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী।



ধর্ম্মতত্ত্ববারিধি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

শিষ্য। আপনার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ লইতে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে; অতএব আর্য্যশাস্ত্রে তত্ত্ব-বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও জ্বলন্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও কেন মানব তাহা বুঝিতে পারে না, এবং কেনই বা তৎসাধনে যত্নবান হয় না, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। বৎস! তোমার ঐ সব প্রশ্ন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। তোমাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর।

(যোগ-বাশিষ্ঠ—স্থিতি-প্রকরণ, দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।)

"সর্ব্ব-ব্যাপী অনাময় অনাদি ভ্রান্তিশূন্য অনন্ত ব্রহ্মের যে চিৎ-প্রতিবিম্ব, সেই চিৎ-প্রতিম্বরূপ সোপাধিক একদেশ হইতে চিৎস্পন্দই তরঙ্গ-চলনে প্রশান্ত সাগরের ন্যায় ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন সাগরের

অন্তর্গত সলিল স্পন্দহীন হইলে স্পন্দধর্ম্মী হয়, তেমনি আত্মার সমগ্র শক্তি প্রথমে স্পন্দশক্তিতে পরিণত হয়। যেমন গগনতলে সমীরণ আপনিই আপনাতে প্রবহমান হয়, সেইরূপ আত্মা আপনাতেই—আপন শক্তিতে—ঐরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন নিশ্চল দীপ স্বীয় শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই ঊর্দ্ধদেশগামী হয়, ঐ আত্মাই তদ্রূপ স্বশরীরে স্পন্দ-শক্তি প্রকাশ করেন। সাগর যেমন জলমধ্যে সলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয়, সর্ব্বশক্তিমান আত্মাও তেমনি স্বীয় শরীরে স্পন্দধর্ম্মী হন। যেমন শারদীয় আতপপুঞ্জে জলনিধি দ্রবীভূত কনকবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিৎসাগর আত্মাতে পরিস্পন্দ দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রকাশধর্ম্মী হইয়া স্ফুরিত হন। যেমন অতীন্দ্রিয় নভোমার্গে মুক্তস্পন্দ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি মহাচিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়। মহাচিদাকাশে সেই চিতিশক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুভিতরূপ হইলেও সাগরে তরঙ্গমালাবৎ অচ্ছচিন্ময়ীই হইয়া থাকে। (বাস্তবিক রূপান্তর হয়।) চিতিশক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথক্‌ভূত বলিয়া বোধ হয়। সূচ্যাদি কঠোরগত আলোক যেমন সাধারণ হইলেও, পৃথক্ একটু ক্ষুদ্রালোক বলিয়া বোধ হয়, ঐ চিতিশক্তিই তদ্রূপ উপাধির অধীন হইয়া পৃথক্‌ভূত (পরিচ্ছিন্ন) হয়। সেই চিৎশক্তি সর্ব্বশক্তিমতী হইয়া ক্ষণকাল স্ফুরিত হইতে থাকে; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্যপ্রকাশবৎ স্বকীয় শক্তি প্রকাশ করে এই প্রকাশাখ্য চিতিশক্তি পরমাত্মা হইতেই সমুদিত হইয়াছে। দেশ, কাল ও ক্রিয়ার শক্তিও সেই চিতিশক্তি হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই চিতিশক্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে আদ্যন্তবিহীন পরমপদেই অবস্থিতি করে। যদি উহার স্ব-স্বভাব জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে স্ব-স্বভাবকে ভ্রান্তিবশতঃ উক্তরূপ কল্পনা করিয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যখন ঐ চিতিশক্তি অতি-বাস্তবরূপে উক্তরূপে ভাবিত হয়, তখন নাম ও সংখ্যাদি দৃষ্টি

আসিয়া উহার অনুগামিনী হয়। সৎস্বরূপ আত্মা হইতে বিভিন্ন কল্পনা যখন অসতী, তখন সমুদ্রের ঊর্ম্মিবৎ চিতে কল্পিত সকল কল্পনাই সেই বিশুদ্ধ চিৎই। কটক ও কেয়ূরাদিরূপে যেমন সুবর্ণের বৈলক্ষণ্য, জগদ্রূপে ভাবিত চিতি ও আত্মাতেও পরস্পর তেমনি বৈলক্ষণ্য; ফলতঃ এই জগদ্ভাব আত্মার আংশিক মাত্র। স্ব-সম্ভূত দীপান্তরের দীপের পার্থক্য যেমন, দেশ কাল ও অবয়বভেদে আত্মা ও চিদাভাসের পার্থক্যও তদ্রূপ। ঐ চিতি দেশ, কাল ও স্পন্দশক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পানুগামিনী হওয়ায় দৃশ্য জগদাকার ধারণ করেন। হে মহাবাহো! বিকল্পবলে সাকার এবং দেশ, কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয় চিতির যে রূপ, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্রশব্দে শরীর; ঐ চৈতন্য উক্তবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিতভাবে জ্ঞান করেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া অহঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অহঙ্কার অধ্যাবসায়পর হইয়া অন্যবিধ কল্পনারূপ কলঙ্কে আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। সঙ্কল্পাক্রান্ত বুদ্ধি তাহার পর মনঃপদ প্রাপ্ত হয়; ঐ মনও ঘনীভূত বিকল্পবলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ভাব ধারণ করে। ঐ ইন্দ্রিয় তৎপরে হস্তপাদময় দেহরূপে পরিণত হয়, ইহা বুধগণ অবগত আছেন। ঐ দেহ লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হইয়া প্রসূত ও জীবভাব প্রাপ্ত হয়। চিতি এইরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সঙ্কল্প ও বাসনারূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও দুঃখ-জালে জড়িত হইয়া চিত্তভাব ধারণ করে। যেমন বদরী প্রভৃতি ফল ক্রমে পরিপক্ক হইয়া কেবল রূপরসাদিগুণের পরিবর্ত্তনরূপ অবস্থাভেদে পূর্ব্ব-বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, আকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি জীবও অবিদ্যামলের পরিণাম বশতঃই বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়; চিৎস্বভাব সেই একই থাকে; কারণ তাহা পরিণমনশীল নহে। জীব সঙ্কল্পবলে অহঙ্কারধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; সেই অহঙ্কার বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়; সেই বুদ্ধি আবার

সঙ্কল্পবলে মনোরূপে পরিণত হয়। সঙ্কল্পময় ঐ মন আকৃতিগ্রহণে তৎপর এবং সসীম তুচ্ছবিষয়ে আসক্ত হয়। তাহার পরে নদী যেমন সাগরের প্রতি অনুধাবিতা হয় এবং গাভী যেমন উন্মাদবৃষের অনুগামিনী হয়, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তি অনুধাবিত হইয়া ঐ চিত্তকে দূষিত করে। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলে চিত্তের অহঙ্কার ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন ঐ চিত্ত স্বেচ্ছাক্রমেই কোষকার-কীটের ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়। হায় কি কষ্ট! আত্মা আপন-দোষেই স্বকীয় সঙ্কল্প অনুসন্ধান করত জালদ্বারা মৃগের ন্যায় বদ্ধ হইয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি যথার্থরূপে অবলোকন করেন, "আমি বদ্ধ হইয়াছি"; সুতরাং তখন তাঁহার বিদ্যাতত্ত্ব (পারমার্থিক আত্মরূপ) থাকে না। তাঁহা হইতে তখন জগৎরূপ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপা অবিদ্যা (জন্মজরাদিভ্রান্তি) উৎপন্ন হইতে থাকে। তখন ঐ আত্মরূপী মন, স্বকল্পিত শব্দাদি বিষয়জালরূপ বহ্নিজালার মধ্যবর্ত্তী হইয়া, নিগড়বদ্ধ কেশরীর ন্যায় নিতান্ত বিবশ হইয়া পড়েন; বাসনাবশে বিচিত্র কার্য্যসমূহের কর্ত্তা হন, এবং আপন ইচ্ছায় রচিত বিবিধ দশার অনুবর্ত্তী হইয়া আরও বিবশ হইয়া পড়েন। মননাদি বিভিন্ন বৃত্তির অনুসারে কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, কখন পুর্য্যষ্টক, কখন প্রকৃতি, কখন মায়া, কখন মল, কখন কর্ম্ম, কখন বন্ধ, কখন চিত্ত, কখন অবিদ্যা ও কখন ইচ্ছারূপে অবস্থিত হন। হে রাঘব! সেই এই চিত্তই আবদ্ধ, দুঃখিত, তৃষ্ণাশোকাক্রান্ত ও রাগভূমি হইয়া বিস্তৃত হন। ঐ চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তর্ভূত ভাবনায় ব্যথিত হন। চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতায় আক্রান্ত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হন। কর্ম্মরূপ তরুবনের অঙ্কুর ইচ্ছাবিকৃত ঐ চিত্ত, স্বীয় উৎপত্তির হেতুভূত আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া, কল্পনাপ্রসূত অনর্থের হেতু হয়। কোষকার-কীটের ন্যায় বন্দন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শোকাকারে পরিণত

হয়; শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ উহার অবয়বস্বরূপ; ঐ চিত্ত অনন্ত নরক-রৌদ্রে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। আত্মার উহা অনাত্মরূপে দৃশ্য হইলেও ঐ চিত্ত এতই দুর্ব্বিবেকে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্দ্ধর হয় যে, উহা বৃহৎ পর্ব্বত-সম গুরু ও ভয়াবহ হইয়া উঠে। ঐ চিত্তই জরামৃত্যুরূপ-শাখাপরিবৃত সংসার-বিষবৃক্ষ। যেমন ক্ষুদ্রবীজমধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ অবস্থিত থাকে, তেমনি আশাপাশবিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিল সংসার ঐ চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে। ঐ চিত্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দগ্ধ; কোনরূপ অজগরকর্ত্তৃক চর্ব্বিত ও কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া আত্মরূপ পিতামহকে (মূলকারণকে) বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং যুথ-ভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় শোকে বিলুপ্তচৈতন্য ও বিষয়ানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতে থাকে। ছিন্নমূল কমলের ন্যায় ঐ চিত্ত সাতিশয় ম্লানি প্রাপ্ত হয়। ঐ চিত্ত যখন স্বীয় নিবাসস্বরূপ এক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তত্তদ্দেহবিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয়; এবং বিষয়, দেহ, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শত্রুগণমধ্যে কেমন বিশ্বস্ত হইয়া বাস করে। ঐ চিত্ত এবংবিধ বিবিধ সঙ্কটদশায় বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। হে অমরোপম! তোমার মন স্বীয় বন্ধনহেতু দেহাদিতে আস্থাবান্ হইয়া সমুদ্রপতিত পক্ষীর ন্যায় বিষম দুঃখে মগ্ন আছে। মন যে জগজ্জালে জড়িত আছে, বাস্তবিক ঐ জগৎ গন্ধর্ব্বনগরবৎ শূন্য; অতএব তুমি বিষয়বিদ্রুত তুচ্ছ অনুরাগ-সাগরে ভাসমান মনকে কর্দ্দমপতিত মাতঙ্গবৎ উদ্ধার কর। হে রাম! মন এক্ষণে বলীবর্দ্দবৎ কাম-পল্বলে অমগ্ন রহিয়াছে, উহার অঙ্গ জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব উহাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ দ্বারা মলিনাকৃতি, উদ্দীপ্তজরা, মৃত্যু ও বিষাদে মূর্চ্ছিত মনে যাহার কিছুমাত্র ব্যথা নাই, হে রাম! এই জগতে সেই ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি রাক্ষস"।

বৎস! মনুষ্যের ধর্ম্মই বিশেষত্ব ঃ—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরানাম।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানা।
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন (কাম), এই চারিটি—পশু এবং মনুষ্য এই উভয়জাতীয় জীবেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কেবল মনুষ্যের ধর্ম্মই বিশেষত্ব। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য॥

ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ, কারণ উহা মৃত্যুর পরেও অনুগমন করে, আর সমস্ত শরীরনাশের সমকালে বিলয় প্রাপ্ত হয়॥

বৎস! সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতের হিতসাধন, ও সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, শাস্ত্রে আছে,—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

সেই এক তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা হয়ে নানারূপে বহু হয়ে বিরাজ করিতেছেন॥

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম"।

"বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবের চরম লক্ষ্য॥"

"কর্ম্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান,—ইহার মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও,—

ইহাই ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ॥ মত, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্যক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র॥"

মহাত্মা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর ;—শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহাই পরমেশ্বরের উপাসনা। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনায় আবশ্যক হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ, যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন, তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া, তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন অর্থাৎ আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না ; অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন, এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, আর ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ-প্রতি-পাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন ; অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।"

কিন্তু বৎস! মানব অবিদ্যামালিন্যে প্রদূষিত ও স্বাভাবিক চাঞ্চল্যে বিচলিত হইয়া প্রকৃততত্ত্ব একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, এক মহাস্বেচ্ছাচারী হইয়া যায়, এবং কামনার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন,

দ্বেষ ও হিংসাসম্বন্ধিনী প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে কিছুমাত্র ব্যাকুলিত হয় না। বৎস! আজ কাল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মানবগণকে নিজের বুদ্ধিদোষে আপন আপন কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া, আমোদ আহ্লাদে ও বাহ্যবস্তু এবং সুখ-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে দেখা যাইতেছে; এবং ক্রমশঃ তাহার অনুসরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, বিকৃত-প্রকৃতি-বশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপদেশ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতার উপর ভক্তি অনুরাগ প্রায়ই লোপ করিয়া দিয়াছে। বৎস! এই অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ—কেবল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। নানারূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা সাধনকে প্রকৃত শিক্ষা বলে। কি উপায়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিদূরিত হইবে, কি উপায়ে নির্ব্বাতদীপশিখাসদৃশ মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সম্পাদিত হইবে, কি উপায়ে প্রকৃত আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে, সেই সব বিষয় উপদেষ্টার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা সাধন করাই প্রকৃত শিক্ষা। জ্ঞান না হইলে মুক্তি নাই। অতএব চিত্তের একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতা সাধন করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করা একান্ত বিধেয়।

সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদে এবং বাহ্যবস্তুর ও সভ্যতার সুখ-ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ না থাকিয়া, কিসে আত্মোন্নতি হইবে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার বিহিত অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া একান্ত কৰ্ত্তব্য; এবং বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাবহ না হইয়া, গীতা-বিনিহিত পরমতত্ত্বের অমিয়মিশ্রিত জ্ঞান অনুভব করা একান্ত কৰ্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানযোগে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি:—

"সত্য কিবা, তারা জানে না কখন,
সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন॥

পিতামাতা জায়া অপত্য বান্ধব
আত্মা ত কখনও নহে এই সব ॥
নাহিক ত তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ,
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ।
কার পিতা তবে কাহার সন্তান,
কার বন্ধু, শত্রু কাহার ধীমান।
একমাত্র যেবা—যেবা সর্ব্বময়,
তাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয় ॥
তত্ত্বমসি ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
উচ্চ রবে তাই এই তান ধর ॥"

বৎস! মানব যে স্ত্রী পুত্র ভাই-বন্ধুদের সুখ-ঐশ্বর্য্যের জন্য এবং নিজের স্বার্থের লালসায় লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, দ্বেষ ও হিংসা-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না, কিন্তু তাহারা কে এবং তাহাদের পুত্রকলত্রাদিই বা কে, এবং কি জন্যই বা এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়াছে, তাহা কি তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিতেছে? তাহারা যে কতক দিবসের জন্য পথের সহচর মাত্র, তাহা কি কেহ এক দিনেরও জন্য ভাবিয়াছে? বৎস! যাহারা তাহাদের শরদিন্দুনিভাননা পত্নী, আদরিণী কন্যা, এবং প্রাণসম পুত্রকে এক মুহূর্ত্তও কাছ-ছাড়া করিতে চাহে না, অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য রোগ-শোকে জর্জ্জরিত হইলে, বল দেখি, তাহারা মৃত্যুর পর কোন উপকার করিতে পারে কি? তাহাদের জন্য উহারা কি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয়? সেই প্রাণসম স্ত্রীপুত্রাদি তাহাদের মৃত্যুর সময় অতিনিকট দেখিয়া, তাহাদের সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক, তখন অশান্তিপ্রদানে রত থাকিবে। কোথায় তাহারা অর্থ রাখিয়াছে, অন্য

কোন ব্যক্তির নিকট কিছু প্রাপ্য অছে কি না, সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিবে। তাহাদের দেহে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার থাকিলে তাহা কাড়িয়া লইয়া, সেই সব জিনিষের পরিবর্ত্তে এক অব্যবহার্য্য বস্ত্র ও কম্বল প্রদান করিবে, এবং তাহাদের মৃতদেহ ঘরের বাহিরে নীত হইলে, পাছে আপনাদের ঐহিক কোন অনিষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় অস্থির হইয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে গোময়ের দ্বারা গৃহ-সংশোধন করিবে। বৎস, মায়াময়ের কি বিচিত্র লীলা! এসব ঘটনাস্রোত মানবের চক্ষে প্রতিনিয়ত প্রতিবাহিত হইতেছে, তথাপি মানবগণ নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া যায়; সংসারের সুখ, দুঃখ ও বাসনার প্রবলস্রোতে পতিত হইয়া, উহার ক্ষণমাত্র চিন্তা করিবার অবসর থাকে না। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু তনু বুদ্ধে মতষি বিতৃষ্টাম্
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥

হে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ণা ত্যাগ কর। শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার প্রতি বিতৃষ্ণাভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজকর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এ সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

শিষ্য। আপনি যে আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ার বিষয় এবং সন্ন্যাসীর গীতে আত্মা সম্বন্ধে এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শ্লোকে "তুমি কে,—স্ত্রী কে," ইত্যাদি যাহা বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব জগতের বিকাশ কি প্রকার, আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ

উপস্থিত কি প্রকারে হয় ও কোথায় বা কোন্ আশ্রমে হইবে, এবং আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কি হয়;—আত্মা কি, মানব কে, অর্থাৎ জীব কে, মানবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, ভগবানের সহিত মানবের কি সম্বন্ধ আছে, ভগবানকে পাইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, মুক্তি কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য কি, ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। বৎস! ক্রমে ক্রমে তোমার মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে ও ধর্ম্ম-বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছ দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, ধর্ম্মবিষয় বিস্তারিতভাবে বুঝাইতে পারি। যাহা হউক, তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সংক্ষেপে জানাইতেছি।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসার।

গুরু। বৎস! এক্ষণে জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ ও সংসারধর্ম্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ।

(যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি-প্রকরণ, দ্বাদশ সর্গ।)

"তিনি (আত্মা) আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল; তাঁহাতে প্রথমে যে কিছু চেত্যতার প্রকাশ হয়, সেই চেত্যজ্ঞান অহংজ্ঞান-পূর্ব্বক হইয়া থাকে ও তাহাতেই সকল জ্ঞান-সংস্কার হয় ও তাহাই আমাদিগের সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের উদ্বোধক। অনন্তর সেই চিত্ত-বৃত্তির ন্যায় বৃত্তিশালী চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তাই অনতিরিক্ত চিন্ময়ী-পরম-সত্তারূপে ব্যবহৃতা হন; পরে যখন তিনি চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ-সংবেদনবশতঃ জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মভাব বিস্মৃত ও পরমপদ ত্যাগ করত পুনঃ সংসারোপাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হন; জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাব দূর হয় না, কারণ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ দ্বারা প্রকাশোন্মুখী হয় এবং তাহাতে তাঁহার কোন রূপ বিকৃতি হয় না। ঐ জীবসত্তার পরেই শূন্যতাস্বরূপিণী আকাশসত্তার আবির্ভাব হয়; তাহাই শব্দাদিগুণের ও আকাশাদি ভাবীসংজ্ঞার কারণ। তৎপরে কালের সত্তাবধারণের সহিত জীবের অহংতা প্রভৃতি অভিমান

জন্মিয়া থাকে; তাহাই ভাবীসৃষ্টি ও জগৎস্থিতির মূল এবং সেই পরমাত্মা হইতেই এই আত্মসংবেদ্য অসদ্রূপ জগৎ উৎপন্ন হইয়া সতের মত প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ অহংতত্ত্বাদিসম্বলিত সংবিদ্—সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তাহার অংশ হইতেই স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য এই অহন্তাববিশিষ্ট আকাশরূপ সত্তাকে শব্দ-তন্মাত্র কহে, ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আকাশতন্মাত্র হইয়া থাকে। উক্ত শব্দতন্মাত্রই শব্দময় বৃক্ষেরও কারণ, যে বৃক্ষ হইতে পদ, বাক্য ও প্রমাণসমন্বিত বেদনিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। নিখিল অর্থে সমবেত শব্দবৃন্দে পরিণত বেদাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই অসীম জগল্লক্ষ্মী উদয় পাইতেছে! যে সমুদায় বায়ুাদি ভূতচয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্যুক্ত চিন্ময় ব্রহ্মই জীবনামে অভিহিত হন; ইনিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদির কারণ, এবং সেই মহাবায়ু হইতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবন ও জরায়ুজাদি প্রাণিনিচয় সম্ভূত হইয়াছে। সেই চিৎশক্তির স্ফুরণে দেহের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহাকেই স্পর্শতন্মাত্র কহে, ও সেই স্পর্শতন্মাত্র-রূপ বৃক্ষ হইতে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধের বিস্তার হইতেছে ও সর্ব্বভূতের স্পন্দনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তাহাতেই চিৎশক্তির বিলাসে তেজস্তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত তন্মাত্র আলোকের বৃক্ষ বলিয়া উহা হইতেই সূর্য্য, অগ্নি, ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজের উৎপত্তি হইয়াছে এবং রূপবিভাগে সংসার বিস্তৃত হইয়াছে। তিনিই সঙ্কল্প-মাত্রে জলময় শরীর প্রাপ্ত হন ও তাঁহারই আস্বাদনকে রসতন্মাত্র কহে। ইহাই যাবৎ দ্রব-পদার্থের কারণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া সংসারের বিস্তার করিতেছে। কল্পনাময় আত্মাই স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে গন্ধতন্মাত্রকে অবলোকন করিয়া থাকেন, এবং উক্ত মনুষ্যাদির আকৃতি-বৃক্ষস্বরূপা ও সকলের আধারভূতা গন্ধতন্মাত্রময়ী ভাবী ভূগোলকেরও মূল-স্বরূপিণী পৃথিবী হইতে সংসার-স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন বুদ্বুদ-

নিচয় জলেই পরিণত হয়, তদ্রূপ চিৎশক্তির ভাবনায় সমুদ্ভূত তন্মাত্র-নিচয়ই পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইতেছে। ইহারা কিছুকাল মিলিত থাকে, পরে পুনরায় বিশ্লেষ প্রাপ্ত হয়; যাবৎ সকলের ধ্বংস অর্থাৎ মহাপ্রলয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বিশুদ্ধ-চিৎশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানা যায় না। যেমন সূক্ষ্ম বটবীজের মধ্যে অসংখ্য বটবৃক্ষ নিবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এই তন্মাত্রসকল গগনমধ্যেই অবস্থান করে, এবং পুনরায় ইহাদিগের হইতেই গগনাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। অঙ্কুরের উদ্গম, শতশাখাকারে প্রকাশ এবং ক্ষণমধ্যে ফলবান্ বৃক্ষে পরিণতি—সূক্ষ্ম-পরমাণুমধ্যেও ভ্রান্তি-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। (স্বপ্নাবস্থায় অতি সূক্ষ্মনাড়ীচ্ছিদ্রেও ত বৃহৎ বস্তুর দর্শন ঘটে।) এ স্থূলভাব বাস্তবিক নহে। এ সকল কখন বিবর্ত্তকে অনুসরণ করিতেছে; পুনরায় বিবর্ত্তশূন্য হইয়া থাকিতেছে; কখন বা চিদাধারে সূক্ষ্ম হইতেছে ও ক্ষণমধ্যে পিণ্ডিত হইয়া স্থূল হইতেছে, এবং সঙ্কল্পাত্মিকা চিৎশক্তিই তন্মাত্রগণ হইয়া ত্রসরেণুর (পরমাণুত্রয়ের) আকার ধারণ করিতেছে; কখন বা নিরাকারা দৃষ্টা হইতেছে। হে রাম! পঞ্চতন্মাত্রই এই দৃশ্যজগতের কারণ এবং পরমাত্মার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। আদিশক্তিই সেই পঞ্চতন্মাত্রেরও কারণ এবং অনুভূতি-গ্রাহ্য আদিভূত অজ চিন্মাত্র সেই আদিশক্তিরও কারণ। এই কারণ-পরম্পরায় জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ হইতেছে।”

সংসারধর্ম্ম।

বৎস! চারিটী আশ্রমের মধ্যে সংসার-আশ্রম প্রধান বলিয়া কথিত আছে। চিত্তশুদ্ধি মানবের মুক্তির সোপান। বৎস! মহাত্মগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই জানাইতেছি।—“চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই; যেহেতু তথায় চিত্ত-বিক্ষেপের

বিষয় না থাকায় তৎপরীক্ষায় কারণাভাব এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে—সংসার-সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মনোনৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাঁহাকে বৈরাগ্যাদিসাধনরূপ কর্ণ, অর্থাৎ হাইল দ্বারা সুস্থির করতঃ সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে।" এই সংসারে থাকিয়া যেমন মানবের আত্মগ্লানি ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, এরূপ সহজে আর কোন আশ্রমে হয় না। কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"জীবের অন্তরে যে এক স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রথমতঃ এক মহাস্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, আর সেই অবস্থায় সহজে কাঁহারও বশবর্ত্তী হইতে চাহেন না। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাচারিতার গুণে পরে তাঁহার চরম ফল ও পরম উপকার লাভ হয়,—পরিণামে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত হইতে হয়। যদিও জীবকে এই অধিকার লাভ করিবার জন্য সংসারে অনেকবার অনেকপ্রকার কষ্ট সহ্য ও অভিনয় করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য এই সংসারই উপযুক্ত স্থান। কামনাই জগত-রহস্যের মূল; কামনা চরিতার্থ হইলে লোকের অন্তরে ভুক্ত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সুতরাং সংসার-আসক্তি কমিতে থাকে। সাধারণতঃ লোকে স্বার্থের জন্য লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির সম্যক্ প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না; আপনি মহামূর্খ হইলেও আপনাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া—মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। এই কামনাই ইহার নেতা। ইহার প্ররোচনায় মানব না করিতে পারে এরূপ কার্য্যই নাই। স্বার্থের লালসায় ব্যাকুল হইয়া মানব শতযোজন পথ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যাইবে, আবার স্বার্থসিদ্ধি না হইলে হতাশ্বাস হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিবে। বৎস!

যখন এই স্বার্থপর মানব পুত্রকলাদির বিয়োগ-বিচ্ছেদে উন্মাদপ্রায় হয় এবং মায়ামোহে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখে ; যখন অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য রোগশোক নিরন্তর আসিয়া মানবের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দেয়, দেহ-মন জর্জ্জরিত করে ; যখন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়া মানুষের মনঃ প্রাণ আকুল হইয়া উঠে ; যখন নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া মানব পদে পদে ভগ্নমনোরথ হয়, পদে পদে নৈরাশ্য নিরুদ্যমতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; যখন বার বার জনন-মরণ-রূপ সংসারগতিতে মানব ক্লিষ্ট হয়, তখন সেই কামনা বা সংসার-আসক্তি ধীরে ধীরে মানবের হৃদয় হইতে কমিতে থাকে। বস্তুতঃ, লোক এ-সংসারে নানাপ্রকার অভিনয় করিয়া, সুখের আশায়ে স্বার্থের জন্য নানাবেশে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াও হৃদয়ের স্বার্থভাব—মনের অতুলনীয় ধনতৃষ্ণা কমাইতে পারে না। কিন্তু সেই মানুষ যখন দেখে, দারা-পুত্র বন্ধু-বান্ধব সকলি কতক দিবসের জন্য পথের পরিচারক মাত্র, তখন তাহার অন্তরে এই ভাব উদয় হয় যে, সংসার ছাড়া আরও কিছু অমূল্য বস্তু থাকিতে পারে। তখন তাহার অন্তরে স্বভাবতঃ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ; তখন সে সংসারে কিছুতেই সুখ পায় না। সে অবস্থায় দুগ্ধফেননিভ শয্যাদি ও দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদিও তাহার পক্ষে যেন বিষময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তখন ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস তাহার পক্ষে যেন বিরক্তিজনক বোধ হয়। যেন তখন তাহার পক্ষে সকলি শান্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। তখন মানব কোথায় শান্তি—কোথায় শান্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। তখন সেই সংসারসেবী, সেই স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ নিভৃতে বসিয়া কোন এক অনুদ্দেশ্য অচিন্ত্য অপরিচিত বস্তুর জন্য কাঁদিবে,—যেন আকুলপ্রাণে দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন্ দিকে দৌড়িবে। যেন তখন একবিন্দু শান্তির জন্য একটা অচেনা, অজানা, এক অতিদূর প্রবাসে নিঃসঙ্গে গোপনে

যাইতে চাহিবেন। তখন সেই সংসারসুখে অতৃপ্ত লোকটি মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, "সংসারে শান্তির আশা—মরীচিকায় যথা জল"। যেন তখন সেই স্বার্থপর, ঘোরনৃশংস আততায়ী, পরশ্রীকাতর, জঘন্য ইন্দ্রিয়সেবী মানব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইবেন। তখন সেই লোকটী অতি ধীরগম্ভীরভাবে অতি বিনীত ও বিনম্রভাবে উপদেশ দিবেন।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্‌ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

তখন সেই লোকটি, যিনি একজন ঘোরসংসারী—মহা অবিশ্বাসী ছিলেন—তিনি অতি বিশ্বাসের সহিত বলিবেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে্ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

বৎস! তখন সেই আততায়ী-পরশ্রীকাতর মানব ভগবানের বাক্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করে। যথা:—

জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

হে ভগবন্! আমি ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই জানি না; কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে না—তাহার কিছুই বুঝি না। হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিয়া থাকি।

বৎস! এই সংসারের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে

নিযুক্ত হইতে পারে, সেই জ্ঞানী। আমি তোমায় সংসারের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাবিষয়-প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মাণু বন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; উহার মূল উর্দ্ধে, উহার শাখা অধোতে অবস্থিত আছে। বেদসমুদায় উহার পত্র। যিনি এই অশ্বত্থবৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। এই বৃক্ষের শাখা অধঃ ও উর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে; উহা সত্বাদিগুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ-রস প্রভৃতি বিষয় সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মপ্রসূতি মূলসকল অধঃপ্রদেশে জীব-লোকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তিভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধ-মূল অশ্বত্থবৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্মমত্বরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মূলভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে; উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। এই যে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সংসার এঁকটী অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ গণ্য। কারণ বৃক্ষের ন্যায় ইহারও মূল

শাখা, স্কন্ধ ও পত্র-পল্লবাদির কল্পনা হইতে পারে। গঙ্গাতরঙ্গদ্বারা অৰ্দ্ধ-সমুৎপাটিত অশ্বত্থবৃক্ষের যেমন মূলভাগ ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করে এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে, সৃষ্টিপরম্পরাগত সংসারবৃক্ষেরও তেমনই ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখা। ইহার মুখ্য মূল আছে; মায়াভি সম্বন্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই সংসারবৃক্ষটী বাহির হইয়াছে। এ নিমিত্ত তিনিই ইহার মুখ্য মূল। তিনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ নিত্য এবং মহান্, এইজন্য তাঁহাকে ঊর্দ্ধ বা ঊর্দ্ধস্থ বলিয়া ব্যবহার করা যায়। অতএব এই সংসারবৃক্ষটী ঊর্দ্ধমূল হইল। তৎপরে প্রথমোৎপন্ন সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ অবধি এই স্তম্ভাদি পর্য্যন্ত যতপ্রকার প্রাণী ও জীব আছে, ইহারা সকলেই সেই মূল হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রসৃত ও বিস্তৃত হইয়াছে। এই জন্য ইহাদিগকেই এই বৃক্ষের শাখা বলিয়া গণ্য করা যায়। এই সকল জীবের অবস্থা অবিদ্যা দ্বারা সমাবৃত হওয়ায় প্রকৃতচৈতন্যস্বরূপ অবস্থা নিতান্ত বিকৃত ও জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে নিকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকেই অধঃ বা অধঃস্থ বলিতে পারা যায়। সুতরাং এই বৃক্ষটি অধঃশাখা হইল, অর্থাৎ ইহার শাখাসকল অধোদিকে প্রসারিত হইতেছে বলা যায়।

বেদমূলক শাস্ত্রসকল নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের এবং ফল শ্রুতিরও প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসংখ্য ক্রিয়াসমূহই এই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ গণ্য হইতে পারে; কারণ বৃক্ষ যেরূপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া এবং প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়া আপন অস্তিত্ব বর্ত্তমান রাখে, এই সংসার-বৃক্ষও তেমনই পরিব্যাপ্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যমান থাকে, কর্ম্মসমূহ দ্বারাই সংসারবৃক্ষের জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ঐ কর্ম্মসমূহের প্রতিপাদক বেদকেও উহার পত্রস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বেদাধ্যয়ন দ্বারা সংসারবৃক্ষের এই মর্ম্ম যিনি অবগত হয়েন, তিনিই প্রকৃত বেদার্থবিৎ।

পূর্ব্বে যে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে; তাহা এইঃ—যদিচ পরমব্রহ্ম অপেক্ষা সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই সংসারবৃক্ষ অধঃশাখাই হইল; তথাপি এই অধোভাগের মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধ ও অধঃভাগ আছে। গঙ্গা-তীরে অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের শাখাগুলি যেরূপ মূল অপেক্ষা অধিকতর অধোগামী হইলেও, কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে অবস্থিতি করে, সংসারবৃক্ষের জীবস্বরূপ শাখাগুলিও তেমনি নিম্নভাগে এবং উপরিভাগে প্রসৃত আছে। যাহারা পাপ-পরায়ণ জীব, তাহারা ক্রমে পশু, পতঙ্গ, কীটাদি অধোযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে; আবার যাহারা পুণ্যাচারী, তাহারা দেবযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এই বৃক্ষের শাখা নিম্নে মনুষ্যলোক হইতে অবীচি পর্য্যন্ত অবসৃত হইয়াছে। আবার উপরে এই মনুষ্য লোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত বিসৃত হইয়াছে। জলসেচনাদি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ সাধারণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে, এই জীবসমূহস্বরূপ শাখাগুলিও তেমনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত ত্রিগুণদ্বারা পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়সমূহ ইহার অসংখ্যশাখার পল্লবস্বরূপ বলা যায়। এই গেল শাখার বিষয়। এই বৃক্ষের মূলসম্বন্ধেও কিছু বিশেষত্ব আছে। এই বৃক্ষের মুখ্যমূল-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাত পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বোর্দ্ধেই বটে; তদ্ব্যতীত, পূর্ব্বোক্ত-মত বৃক্ষের যেরূপ একটা মুখ্যমূল থাকে, আর তাহারই অনুগত চতুঃপার্শ্ব-ব্যাপক আরো অসংখ্য মূল থাকে, তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গঙ্গাতীরস্থ অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের) যেটী মুখ্য মূল, সেইটী উপরের দিকেই থাকে, আর তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল অবান্তর মূল আছে, তাহার কতকগুলি ঊর্দ্ধদিকে, আর কতকগুলি অধোদিকে অবস্থিতি করে; সেইরূপ এই সংসার-বৃক্ষেরও কতকগুলি অবান্তর মূল আছে; তাহারও কতকগুলি অধোদিকে

প্রসৃত, আর কতকগুলি ঊর্দ্ধদিকেও আছে। সুখজনক বিষয়ে অনুরাগ এবং দুঃখজনক বিষয়ে বিদ্বেষ দ্বারাই জীবগণ এই মনুষ্যলোকে নানা-প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা জীব হয় উত্তমযোনি, না হয় অধমযোনি প্রাপ্ত হয়। বাসনা না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ কোন যোনি প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং সংসারে থাকে না। অতএব বাসনাকেই এই সংসারবৃক্ষের অবান্তর মূল বলিতে পারা যায়। তন্মধ্যে যে-গুলি নীচ বাসনা (বৈষয়িক সুখ-বাসনা), সেইগুলিকে অধঃপ্রসৃত, আর যেগুলি উচ্চবাসনা (আত্মোন্নতি-বিষয়িণী), সেইগুলিকেই ঊর্দ্ধপ্রসৃত বলা যাইতে পারে।

বৎস! একজন মহাত্মা লিখিয়াছেন :—

"চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই; যেহেতু তথায় চিত্তবিক্ষেপের বিষয় না থাকায় তৎপরীক্ষার কারণাভাব এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জ্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে—সংসারসমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মনোনৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে; তাহাকে বৈরাগ্যাদি-সাধনরূপ কর্ণ অর্থাৎ হাইল দ্বারা সুস্থির করতঃ সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই তদীয় নিরাপদত্ব অব-ধারিত হইতে পারে।

"ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের দ্বাদশাধ্যায়ে চতুরাশ্রমের কর্ত্তব্যতা বিষয়ক যে বর্ণনা আছে, তাহাতে এই বিধান দৃষ্ট হয় যে, প্রথমতঃ গুরুকুলে অর্থাৎ আচার্য্যগৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন এবং সাধনা সম্পন্ন করিয়া, তদুত্তর যাহার গৃহস্থ হইবার সম্ভাবনা হয়, সে দারপরিগ্রহ করিবে, এবং যাহার তদিচ্ছা না হয়, সে বনে গমন করিবে। একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট আশ্রমধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া, গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ, নিজ পোষ্যজনের ভরণপোষণ, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে যাগাদি, কুটম্বের আসক্তিত্যাগ, অনুদ্যমে অথবা সুবৃত্তি দ্বারা লব্ধধনে ব্যয়নির্ব্বাহ,

সংসারের অনিত্যতা বিচার, স্ত্রীপুত্রের সহিত পথিকের মিলন, শরীরের সহিত কুটুম্বের নাশ বিবেচনা, গৃহকর্ম্ম করণান্তর ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বর-পূজা, অহং-মমতা ভাব পরিত্যাগ-করণ, ঈশ্বরনিষ্ঠায় সমাহিত হওন, ও অতিথির ন্যায় গৃহে বাসকরণের বিধান দিয়াছেন, এবং বাণপ্রস্থের নিয়ম এই উক্ত করিয়াছেন যে, অরণ্যবাস ও মৃত্তিকায় শয়ন, ফলমূলাদি আহার, বল্কল বা অজিন পরিধান, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ, কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু আদি ধারণ, শরীরের মলা অমার্জ্জন, দণ্ডধারণ না করণ, ত্রিকালীন স্নানকরণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় জলধারাসহন, শিশিরে জলমগ্ন হওন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা তপস্যা করিবে। অতএব, স্পষ্ট জানা যায় যে, গৃহে মনের সাধন ও বনে শরীরের সাধন হয়, এবং সন্ন্যাসধর্ম্মী কেবল জ্ঞান-লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনপূর্ব্বক সুখে বিচরণ করে।”

বৎস! সংসারে থাকিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে; তাহাও তোমাকে জানাইতেছি। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

“ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা॥
স্বাধ্যায়ে নার্চ্চয়েতর্ষীণ হোমৈর্দেবান যথাবিধি।
পিতৄন শ্রাদ্ধে নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মনা॥

মাননীয় গিরীশচন্দ্র মহাশয় ইহার উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—

ঋষিগণ পিতৃগণ আর দেবগণ।
অতিথিনিচয় আর সর্ব্বভূতগণ॥
গৃহস্থের কাছে আশা করেন সদাই।
জানিয়া সে আশা পূর্ণ করা সদা চাই॥
স্বাধ্যায়ে তুষিতে হয় যত ঋষিগণে।
দেবগণে তুষ্ট কর হোম-সম্পাদনে॥

শ্রাদ্ধ করি পিতৃগণে, নরে অন্নদানে।

ভূতগণে বলিকর্ম্মে তোষ সাবধানে॥”

গৃহস্থের এই সব কর্ম্ম ; অতএব এই কর্ম্মগুলি যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার বিহিত অনুষ্ঠান করা উচিত। সংসারে থাকিয়া সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্ব-ভূতে আত্মবৎজ্ঞান ও হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন, যথা :—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাম্ পুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽস্মিন দেহভাজাং
অন্তস্থিতে যেন ভবন্ত্যদুঃখা॥
ক্ষুত্তট্ শ্রমোগাত্র পরিশ্রমশ্চ।
দৈন্যং ক্লমঃ শোক বিষাদ মোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো
র্জিজীষোর্জীব জলার্পনাম্মে॥

গিরীশবাবু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নাহি চাই পরাগতি ঈশ্বরের পায়।
না চাই নির্ব্বাণ আর সিদ্ধি সমুদায়॥
যত জীব আছে, যথা দুঃখহীন রয়।
এই শুধু তব পদে চাহি দয়াময়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম আর শরীর-যাতনা।
দৈন্য ক্লেশ শোক আর বিষাদ সে নানা॥
মোহ-আদি সব মোর গিয়াছে চলিয়ে।
তোমার জীবের আজি তৃষ্ণা বিনাশিয়ে॥

অতএব, সংসারে থাকিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতের হিতসাধন ও সর্ব্বভূতে আত্মবৎজ্ঞান করিলেই মুক্ত হইতে পারে। বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান—সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ; কি প্রকারে উহা লাভ হয়, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা:—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতাণি আত্মন্যে বানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্‌সতে॥
যস্মিন্‌ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো'মোহঃ কঃ,শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥
ঈশোপনিষৎ।

গিরীশবাবু যাহা উত্তমরূপে ব্যাখা করিতেছেন—তাহাও বলিতেছি।

আত্মাতে যে জন দেখে সর্ব্বভূতগণ।
সর্ব্বভূতে আত্মা আর করে দরশন॥
ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হৃদে হয়েছে উদয়।
কাহাকেও আর তার ঘৃণা নাহি হয়॥
যখন সকল ভূতে আত্মজ্ঞান হয়।
জ্ঞানীর তখন কোথা শোক মোহ রয়॥

কারণ, শাস্ত্রেই আছে:—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব॥

সেই এক তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা হয়ে নানারূপে বহু হ'য়ে বিরাজ করিতেছেন॥



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীব।

বৎস! জীবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, এবং জীব কে, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥

গীতা।

"হে ভারত! মহৎপ্রকৃতি গর্ভাধান-স্থান। আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। তাহাতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তিমাত্রস্বরূপে অবস্থিত জীবসকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা নিশ্বাস-বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, পিতার দেহে প্রবেশ করে; পরে তাহা এমন অভিন্নভাবে পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকারে তাঁহাদের প্রার্থক্য অনুভব করা যায় না,—যেন একেবারে একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী ও পুরুষের যোগ হয়, তখন ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃ-জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার দেহে একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি-সাধন পূর্ব্বক, আবার মাতা হইতেই বিশ্খলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মা আর প্রকৃতি হইতে—

ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি যতপ্রকার জন্য-পদার্থ আছে, এতৎসমস্তই মহাপ্রলয়কালে ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; তখন কোন প্রকার জন্য-বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না,—একমাত্র প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের যে পৃথক্ পৃথক্ জীবনী-শক্তি আছে, তাহাও ঐ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; কারণ, উহাও প্রকৃতি-জন্য পদার্থ। এদিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বনস্বরূপ বা আত্মা-স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্য-সমুদ্রে মিলাইয়া যায়, ইহাঁদের কিছুমাত্র পার্থক্যের অনুভব হয় না; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা অথবা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস-স্বরূপ সংযোগ থাকাতে, সেই পূর্ব্ব-বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যগুলি, সেই সুবৃহৎ চৈতন্যস্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পূর্ব্ববিলীন, আপন্ আপন্ জীবনী-শক্তিও গ্রহণ করে, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-স্বরূপা মাতাতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই হইল প্রকৃতির গর্ভাধান ব্যাপার। পরে ঐ প্রকৃতি হইতে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এবং পোষণশক্তি, সংমিশ্রিত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য জীবের পৃথক্ পৃথক্ দেহ বা লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ সংগঠিত হয়; তখনই পৃথক্ পৃথক্ জীবের জন্ম হইল বলা যায়। তৎপরে সেই জীব হইতেই প্রকৃতির অংশসকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ব্রহ্মা অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীদেহের বিকাশ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মা বা আত্মাই, জগতের পিতা এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাতা।"

বৎস! জীবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বুঝিতে পারিলে। এইবারে জীব কে—তাহাও বুঝাইতেছি।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

গীতা।

"এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতি-বিলীন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।"

"এই জীবলোকে যত জীব আছে (প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য আছে) তৎসমস্তই আমার অংশবিশেষ সুতরাং উহা সনাতন (নিত্য)। পরন্তু একটি মৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার যেরূপ এক একটি অংশ হইতে পারে, এই জীবগণ আমার সেরূপ অংশ নহে; কারণ, আমি অখণ্ড অদ্বিতীয় নিরবয়ব বস্তু। সুতরাং কোন মতেই আমার খণ্ড খণ্ড ভাগ হইতে পারে না। তবে কি না আকাশ যেরূপ অখণ্ড ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও নানা প্রকার মেঘের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়,—এক পরিব্যাপ্ত আকাশেই যেখানে শুভ্রবর্ণ মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেইস্থান শুভ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং যেখানে নীলমেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেই স্থানেই নীল আকাশ, আর যেখানে রক্তমেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেই খানেই রক্তাকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়,—ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞানবশতঃ একই আকাশ নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়, আবার ঐ রক্তাকাশ, পীতাকাশ, শুভ্রাকাশ ও নীলাকাশ প্রভৃতিকে মহান্ আকাশের অংশ বলিয়াও গণ্য করা হয়; আমিও সেইরূপ একও অখণ্ড পদার্থ হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকাতে প্রকৃতি এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত হই; আবার যে স্থানটা প্রকৃতি হইতে বিকসিত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিয়া খ্যাত। আবার ঐ মন ও ইন্দ্রিয়াদিরও অসংখ্য প্রকারভেদ থাকাতে, উহাদের অসংখ্যপ্রকার

আকৃতি হইয়া থাকে ; তাহারাই আমার অংশ বলিয়া গণ্য হয়। বাস্তবিক আমিই তাহারা, তাহারাই আমি ; ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ হইতে পারে না।”

বৎস! তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে ঃ—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ॥

এবার এই শ্লোকের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলে ?

যোগাবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকরণ ত্রয়োদশ সর্গ।

“হে রাম! নভঃ, তেজঃ তমঃ সমস্তই অনুৎপন্ন, উহাদের সত্তার কারণ—চিদাত্মা পরব্রহ্ম। উক্ত চিদাত্মাই মায়াকাশে বিকাশ পাইয়া প্রথমে চেত্যবিষয়িনী কল্পনাকে পরে তৎসংযুক্ত জীবভাবকে ও অহংজ্ঞানকে উৎপাদন করেন। উক্ত অহংতার পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয় ও বুদ্ধি হইতেই মননধর্ম্মী মনের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রাদি-বিশিষ্ট হইয়া মন হয়। এই মনই তন্মাত্রপঞ্চকের মেলনে মহাভূতাকারে বর্দ্ধিত হইয়া জগদাকার মহাগুল্ম দৃষ্ট হন। যেমন অকৃত বা অদৃষ্ট বস্তুকে স্বপ্নে হঠাৎ দেখা যায়, তদ্রূপ চিদাত্মা মনের আবেশে জগৎ দেখিতেছেন, সুতরাং এই বিশ্ব চিন্ময় আকাশে বারংবার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে।

“স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই চরাচর জগৎও প্রলয়ে বিনষ্ট ইইয়া থাকে। তৎকালে যে অনির্ব্বচনীয় সৎপদার্থ অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার নাম নাই। তিনি তখন অভিব্যক্তি-শূন্য। তিনি তেজঃ নহেন, অন্ধকারও নহেন ; তিনি নিষ্ক্রিয় এবং অপরিচ্ছিন্ন। পণ্ডিতগণ বাক্য-প্রয়োগ ব্যবহারসিদ্ধির জন্য পরমাত্মার, ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় আপনিই আত্মমায়ায় জড়রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবনামে বিড়ম্বিত জীব-

ভাব যেন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন (তিনি ঈশ্বর)। অনন্তর সেই চৈতন্যময় বস্তু মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প অবলম্বন হেতু জড়ভাবের সম্বন্ধ-বাহুল্য প্রাপ্ত হইলে পরপ্রণারূপ ও পঞ্চভূতরূপ পরিগ্রহ করেন। •

"কিন্তু বৎস, এইটি খুব স্মরণ রাখিবে যে (যোগাবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকরণ) এই যে চেতন জীব জন্মরূপ নির্জ্জন অরণ্যে বিকীর্ণ হইতেছেন, ইঁহাকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ; কারণ সেই জীব বুদ্ধি সংসার ও দুঃখসমুদয়ের কারণ, সুতরাং ইঁহাকে জানিলে কিছুই জানা হয় না। যদি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ জীবের জীবভাব পরিহার পূর্ব্বক, পরমভাব গ্রহণ করা হয়, তবেই বিষবেগ উপশান্ত হইলে বিসূচিকা রোগের ন্যায়, দুঃখসমুদয় এককালে বিদূরিত হইয়া থাকে।"

বৎস! ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানিচ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ॥

"ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিবে। ব্রহ্মই সকলপ্রকার নাম, বিবিধপ্রকার রূপ, ও সমস্ত কর্ম্ম ধারণ করিতেছেন, ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন॥"

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

যদা ভূত পৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।

গীতা।

মান্যবর পাত্র মহাশয় ইহা সুন্দরভাবে ব্যাখা করিয়াছেন, যথা :—

জীবের পার্থক্য যবে, অভিন্নতা অনুভবে,
একতায় সম অবস্থিত।
প্রকৃতির গুণোদ্ভূত, বিস্তরেও একীভূত,
ব্রহ্মপ্রাপ্তি তখনি কথিত॥

জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্মপদার্থ হইলেও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারে না; এই জন্য ব্রহ্ম হইতেই পৃথক্ বলিয়া আপনাকে মনে করে। কিন্তু যখন তাহার সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন সে যে স্বয়ং ব্রহ্মপদার্থ, ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাকেই জীবের ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বলে। এদ্ব্যতীত মুক্তির অবস্থায় কোন অপ্রাপ্ত নূতন বস্তু পায় না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

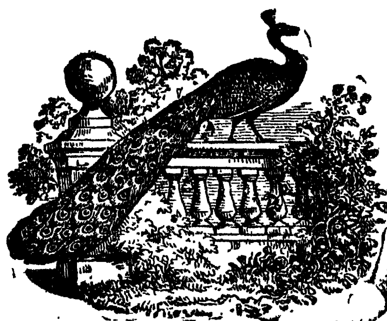
"রজ্জুজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহি স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মানো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জুর্জীবোনাহং দেশি কোক্ত্যা শিবোঽহম্॥

অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞানীলোকের উপদেশে সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ থাকে না,—রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইলে, "আমি জীব নহি" অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে॥

শিষ্য।—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে এই বুঝিলাম যে, আমি তুমি কিছুই নহে—সকলি ব্রহ্ম, এবং আমিই সেই আত্মস্বরূপ। সংসারে তিনিই অবলম্বনীয় এবং জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানিতে হয়; ইহা জ্ঞানযোগ।

যদি তাহাই হয়, তবে কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি? যখন আমিই সেই আত্মস্বরূপ, তখন আমার কাজে আবশ্যক কি? দ্বিতীয় কথা, যদি সবই ব্রহ্ম, তবে কেহ কেহ সুখীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরসুখভোগ করিতেছে; কেহ দুঃখীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছে; আবার কেহ পাপাচারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার কেহ বা পুণ্যাচারীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেন?—ইহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস! এই সব ধারণাই মতভেদের কারণ। যাহা হউক, তোমাকে আমি ভালরূপে জানাইব। বৎস! মানব আপন আপন কর্ম্ম বা গুণ দ্বারা সদসদ্ যোনি প্রাপ্ত হয়, গুণসম্বন্ধে তোমায় স্থানান্তরে জানাইব। এখন তোমার অন্য সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, শ্রবণ কর।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের স্বরূপ।

গুরু।—বৎস! স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে মানুষের স্বরূপ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে জানাইতেছি; তাহা হইতেই তুমি সবই বুঝিতে পারিবে। আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত, আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্যসাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর ও মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ প্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা বিনশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখনও বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী। তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই জানি যে, উহা পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলনমাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিল, এবং অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন বেদান্তবাদীদের মতে যখন

এই শরীরের পতন হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই সূক্ষ্মশরীরেই মানুষের সমুদায় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি ? মন যেন হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই রূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে।

কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত না হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়; কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না,—আবশ্যক হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতররূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকে স্মৃতি বলে। এইরূপ আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে, এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে। উহারা আবার সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা এই সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান ও এই বিভিন্ন সংস্কাররূপ শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। যাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া সূর্য্যলোকে উপনীত হন; তথা হইতে চন্দ্রলোকে এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপনীত হন। তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই স্থানে উহাঁরা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করেন। তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়। আর অদ্বৈতবাদীদের মতে তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস

করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে কল্পবাসনা ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন।

যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য্য করেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্ম-শরীর—দেবশরীর লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা দেবতা হইয়া তথায় বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করে। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান্ হয়; সুতরাং তাঁহাদের মর্ত্ত্যলোকে পতন হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক, প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির-দ্বারা পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে।

যাহারা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা ভূত বা দানব হয়, এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কেহ কেহ আবার মানুষের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐ স্থানে থাকিয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়,—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁহুছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব অল্প পরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্য্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝামাঝি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ

স্বর্গে বাস করেন। তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়; তারপর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলে; ভাল মন্দ কর্ম্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকামী হইয়া সৎকার্য্য করিলে স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় আর তিনি কোন নূতন কর্ম্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহার কৃত সৎকর্ম্মের ফল ভোগ করেন; আর এই সৎকর্ম্ম যেই শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহার উপর বেগে আইসে; তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম্ম না করিয়াই কেবল ভূতকর্ম্মের ফলভোগ করে; তাহারা পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নূতন কর্ম্ম করে না। তারপর তাহারা আবার মানুষ হয়।

অতএব বেদান্ত-দর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। কারণ, এই খানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে, মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর ও মনের পশ্চাতে যে আত্মা বলিয়া একটী পদার্থ আছে—ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই কি যথেষ্ঠ ব্যাখ্যা হইল না? আর একটী তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তি খুব প্রবল। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর

বোধ হয় এই শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকেই এই তত্ত্বটী এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনোঽতিরিক্ত অথচ শরীর ও মনের আশ্রয়ভূমিস্বরূপ আত্মা নামক একটী পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার আবশ্যক কি? শুধু শরীর ও মন বলিলেই যথেষ্ঠ হয়। নিয়তপরিণামশীল জড়স্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে তাহা কিসে হয়?

বৌদ্ধ বলেন, এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জ্বলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক; ঘুরাইলে একটি অগ্নির বৃত্ত স্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই, জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা কর, বল; কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবলচিন্তাস্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাখিয়া যাইতেছে; সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা কি? এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়স্রোত ও চিন্তাস্রোত,—কেবল ইহাদেরই অস্থিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি? আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ই বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ-দর্শনের স্থূল কথা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্য্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সর্ব্বস্ব; কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? পদার্থের জ্ঞান আইসে কেবল গুণরাশির

বেগে ; স্থান-পরিবর্ত্তন বশতঃ কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নহে। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল। বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশ্য-জগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্য-পরিমাণশালী মাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্পলোকেই আমাদের পশ্চাদ্দেশস্থ সেই স্থির-সমুদ্রের অত্যল্প আভাসও পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণ মাত্র। তাহাহইলে আমরা দুই মত পাইলাম। একটি এই,—এই শরীর ও মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে। আর একটি মত—এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই ; সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম। অদ্বৈতবাদেই কেবল এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতে একটি পরিণামী আশ্রয় আছে। দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য। অপরি-ণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামীরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে ; আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকেও আবার পরিণামীরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পরে—যতক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা স্থির শান্ত ছিল ; যখন উহা শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য স্বরূপ ছিল অর্থাৎ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চলিয়াছে';—যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন। কিন্তু উহা যে শরীর মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, একথা ভুল। বৌদ্ধেরা

যে বলেন, সমুদায় জগৎ যে কেবল পরিণাম-প্রবাহ মাত্র, একথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোটকথা, যতদিন দ্বৈতবাদ থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা,—এই জগৎ পরিণামীও বটে, অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, এই তিনটী পৃথক্ বস্তু নহে; উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়াই প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না; আর যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। আবার যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর মন কোথায় চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না; আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়। সর্পে রজ্জুভ্রম হইলে, যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়; আর যখন ভ্রান্তি দূর হইয়া সেই ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথায় চলিয়া যায়। তাহা হইলে দেখা গেল, একটী মাত্র বস্তুই আছে; তাহাই নানারূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। উহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা আর যা কিছু বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে, এই আত্মাই ব্রহ্ম,—কেবল নামরূপ উপাধিবশতঃ উহার বহুপ্রতীতি হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটী তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নাম, রূপ, তরঙ্গের আকৃতি, আর আমরাই উহাকে তরঙ্গই এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম রূপ চলিয়া গেলে, উহা যে সমুদ্র ছিল সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল;

কেবল নাম ও রূপই যত প্রার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্য্যের একটি পূর্ণ-প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তদ্রূপ সেই এক আত্মা—সেই এক সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক; বাস্তবিক আমি বা তুমি বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সবই মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। যখন বিবেকের জ্ঞানে মানুষ বুঝিতে পারে,—দুইটী বস্তু নাই, একটী বস্তু আছে, তখন তাঁহার উপলব্ধি হয়—তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়াছেন। আমি এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ; আমি আবার অপরিণামী নির্গুণ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময়। অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ—অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা আছেন, তাঁহার কখনও পরিণাম হয় নাই। আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিশাইয়া গেল; তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে; কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরূপকে মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সৃজন করিয়া, একজনকে আর এক জন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে—বলা যাইতে পারে না; কারণ, উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই—তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নাম-রূপ

অথবা ইউরোপিয়ানগণের মতে দেশ, কাল ও নিমিত্ত—এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎ-সত্তা দেখাইতেছে। পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ এই দুইটী বস্তুর কল্পনা করেন, তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন—একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়-জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্ম-জগতে, সর্ব্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে।

এখন প্রমাণিত হইতেছে যে তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্ব্বে সূর্য্য ছিল, তাহা আজ হয়ত মানুষের ভিতরে আসিয়াছে; কাল হয়ত উহা পশুর ভিতরে যাইবে; আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। উহা সর্ব্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি; কেবল নাম ও রূপে পৃথক্। ইহার এক বিন্দুর নাম সূর্য্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ্, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম—ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর-একভাবে দেখিলে চিন্তা-সমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে। উহার এক এক বিন্দু এক একটি মন। তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক একটি মনমাত্র। আবার এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে দ্বৈতবাদীর পরলোক-বাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎ লোক ভূত হয়, পরে পশু হয়,—এসব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন,—কেহ

আসেও না, কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তরূপ; তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়? কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল,– পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই এই প্রশ্নটা বুঝিতে পারে নাই; সুতরাং যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, সেই সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা, আর একটি প্রশ্ন তুলিয়া, ঐ প্রশ্নটীর উত্তর করিল,—"কোথায় উহা পড়িবে?" ফলতঃ মূল প্রশ্নটাই ভুল। জগতে উচু নীচু বলিয়া কিছুই নাই। উঁচু নীচু কেবল আপেক্ষিক মাত্র। আত্মাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভুল। কে যায়—কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে পূর্ব্ব হইতেই তোমার অবস্থিতি নাই? মানুষের আত্মা সর্ব্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মা ত সর্ব্বত্রই। সুতরাং সম্পূর্ণজীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালক-সুলভ স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালকসুলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্ন, সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানের পক্ষে উহা থাকিয়া যায়। সমুদয় জগৎ—স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে,—একথা বিশ্বাস করে কেন? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি; উহার পাতা উল্টান হইতেছে। এক পৃষ্ঠার পর আর এক পৃষ্ঠা আসিল; উহা উল্টান হইল। পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে? কে যায় আসে? আমি নই! কেবল পুস্তকের পাতা উল্টান হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখস্থ একখানি পুস্তকস্বরূপ। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উল্টান হইতেছে। নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে; উহা পড়া হইয়া গেল ও উল্টান হইল। আবার নূতন

অধ্যায় আসিল। আত্মা যেমন তেমনই অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন,—আত্মা নহেন। উহার কখনও পরিণাম হয় না; জন্ম মৃত্যু প্রকৃতিতে,—তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে, আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি,—প্রকৃতি নহেন। যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি, সূর্য্যই চলিতেছেন—পৃথিবী নহে। এসকল সুতরাং ভ্রান্তি মাত্র। যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্ত্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি, জন্মমৃত্যুও ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারা আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না। আমরা একরূপ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকেই দেখিতে পাই। সেই যন্ত্রগুলিই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়, যেগুলি এক প্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে কর, আমরা এক্ষণে যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা মানবকম্পন নাম প্রদান করিতে পারি। যদি উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না; উহার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে। হয়ত দেবতা ও দেবজগৎ; কিম্বা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানব-জগৎ; কিন্তু ঐ সকলগুলিই এই এক জগতের বিভিন্ন ভাবমাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতিরূপে; আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে উহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে। আবার যাঁহারা স্বর্গে যাইতে চাহেন, তাঁহারা ঐ স্থানকে স্বর্গ বলিয়া দেখিবেন। যাঁহারা সারা-জীবন ভাবিতেছেন, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকটে গিয়া সারা-জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তস্থ ঐ বিষয়ই দেখিবেন। তাঁহাদের চক্ষে এই জগৎই একটি বৃহৎ স্বর্গে

পরিণত হইয়া যাইবে। তাঁহারা দেখিবেন,—নানাপ্রকার অপ্সর কিন্নর চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদয় মানুষেরই কৃত। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন, দ্বৈতবাদীর কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই সব দৈত্য, পুনর্জন্ম, প্রভৃতি সবই রূপক। মানব-জীবনও তাহাই। এইগুলি কেবল রূপক, আর মানব-জীবন সত্য, তাহা হইতে পারে না। মানুষ সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিষ যথা স্বর্গ, নরক, প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে; কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র; আর সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা এই যে, আমরা শরীর, যাহা আমরা কখনই নই এবং কখনও হইতে পারি না। আমরা কেবল মানুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি। যিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল পরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর মোহরের একটা থলি রাখিলে; মনে কর, এক জন দস্যু আসিয়া ঐ মোহরের থলি লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান উভয়ই সমান। তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকেই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়। কিন্তু সাধুলোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকস্বরূপ দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে; আর যাঁহারা পূর্ণসিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবানস্বরূপ দর্শন করেন। তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান—তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—

যে সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়িত করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখনও উর্দ্ধে, কখনও অধোতে, কখনও পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, তিনি বাস্তবিক সর্ব্বব্যাপী; তিনি কালের অধীন নহেন—কালই তাঁহার অধীন, এবং সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে। তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন; আর মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে। যিনি কোন দেবতায় অবস্থিত নহেন, তিনিই দেবাসুর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ্, প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা। আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর, এবং সর্ব্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়; তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়; তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়; সব দুঃখ দূর হইয়া যায়; সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখও চলিয়া যায়, তাঁর সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়; পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাঁর সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন এক অব্যক্তভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়। আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতিবিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ পৃথিবী উদ্ভিদ্ পশু মানুষ দেবতা প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায়। আর জ্ঞানী-পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ্। যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়,

সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে; কিন্তু উহারা এক সেই অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখনও পরিণাম প্রাপ্ত হয় না; মেঘ কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটি—এই অদ্বৈত-জ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্য্যন্ত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব? হাঁ,—সম্পূর্ণ সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। ইহাঁরা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। এক কাষ্ঠখণ্ড-সংযোজিত দুইটি চক্র একত্রে চলিতেছে। যদি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠখণ্ডটি কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যায়। পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর এই শরীরমনোরূপ ভ্রান্তি আর একটি চক্র,—কর্ম্মরূপ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উহারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগ-দণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। তখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে—তখন আত্মা আসিতেছেন, যাইতেছেন, অথবা তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইতেছে—এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন। আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিত ভাব এবং অভাব, বাসনা—সবই চলিয়া যাইবে। তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ বাসনা-বিরহিত। কিন্তু শরীর-মনোরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যত দিন না এই প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, তত দিন উহা থাকিবে। এই বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর-মনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ

হইতে ফিরিয়া আসা, এমন কি ব্রহ্মলোক গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যাইবে। তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসার-দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য।"





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি কে? তুমি কে? মুক্তি ও বন্ধন।

(যোগবাশিষ্ঠ, উপশম-প্রকরণ, ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।)

(মাণ্ডব্য ঋষি প্রস্থান করিলে, রাজা একান্তে:গমন পূর্ব্বক নিজ সাধু-বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,) " আমি কে? আমি দৃশ্যমান মেরুপর্ব্বত নহি: এই জগৎও আমার নহে। আমি শৈল নহি, এই শৈলও আমার নহে। আমি পৃথিবী নহি; এই পৃথিবীও আমার নহে। আমি এই কিরাতমণ্ডল নহি; এই কিরাতমণ্ডলও আমাব নহে। "সর্ব্বজনের সম্মতিক্রমে এই দেশের রাজ্যে আমি অভিষিক্ত"—এই রূপ সঙ্কেতে (কল্পনামাত্রে) কেবল এই দেশ আমার হইয়াছে; (বাস্তবিক ইহা আমার নহে)। আমি এক্ষণে উক্ত সঙ্কেত পরিত্যাগ করিলাম। আমি এদেশ নহি, এই দেশও আমার নহে। কথিত পদার্থসমূহ-মধ্যে কিছুই আমি নহি। এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগরী, তাহাও আমি নহি, ইহাই স্থির। পতাকারূপ বনশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে উদ্যানসঙ্কুল, গজ-অশ্ব-সামন্ত-ভৃত্য-পরিজন-সমন্বিত এই পুরীও আমি নহি; ইহাও আমার নহে। বৃথা সঙ্কেতবশতঃ আমর সহিত এই সমস্ত সম্বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে সে সঙ্কেত অপগত হওয়াতে আমার উক্ত প্রকার দৃশ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধ গিয়াছে। অবশিষ্ট ভোগসমূহ ও কলত্র, তাহাও আমি নহি;

উহাও আমার নহে। এইরূপ ভৃত্য-বাহন-নগর-সম্বলিত এই রাজ্যও আমি নহি ; এই রাজ্যও আমার নহে। উক্ত সঙ্কেত কেবল ব্যবহার-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ফলতঃ উহা মিথ্যা। এক্ষণে অবশিষ্ট হস্তপদাদিমান্ দেহ ; বোধ হয় এই দেহই আমি। এক্ষণে এই দেহ-বিষয়ক বিচার করিয়া দেখি,—এদেহ আমি কি না ? এই দেহস্থিত যে অস্থিমাংস, ইহা ত আমি নহি ; কারণ ইহা অচেতন, আমি সচেতন। পদ্মপত্রে সলিল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এই অস্থিমাংসাদির সহিত আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহি। মাংস, অস্থি, রক্ত, এ-সমস্ত জড় পদার্থ ; সুতরাং আমি ইহা নহি এবং এ সকলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। এই হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও আমি নহি ; ইহারাও আমার নহে। এই দেহমধ্যে যে কিছু জড়পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ও আমি নহি, কারণ আমি চেতন। এই ভোগসমূহও আমি নহি ; এ সকলও আমার নহে। জড় অসৎস্বরূপ এই বুদ্ধীন্দ্রিয়ও আমি নহি এবং ইহারাও আমার নহে। সংসার-দোষের মূল এই মনও আমি নহি ; কারণ উহা জড়। এই যে অহঙ্কার বুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও আমার নহে ; যেহেতু উহা মনেরই অবস্থাবিশেষ। এইরূপে শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া মন-বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি পর্য্যন্ত স্থূলসূক্ষ্মভূত-প্রপঞ্চ, ইহার মধ্যে কোনটীই আমি হইতে পারিলাম না। এক্ষণে ইহার অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ। এক্ষণে অবশিষ্ট জীব, সে যদি চেত্য বিষয়ের চেতনা (প্রমাজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত জীব চেতন-প্রমাতা) হইতে পারে এবং আমিও উক্ত জীব, ইহা বলিতে পারি ; কিন্তু ঐ জীবও সাক্ষী-চৈতন্যকর্ত্তৃক বোধ্যমান হইয়া থাকে, সুতরাং উহাও আমি নহি। উহার নিজের কোন শক্তি নাই। যেহেতু সাক্ষীসংবেদ্য প্রমতিপ্রমেয় উক্ত জীব আমি নহি ; সুতরাং আমি উহা ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমি ঐ সকলের অবশিষ্ট বিকল্পবিবর্জ্জিত বিশুদ্ধচিৎই হইলাম। কি আশ্চর্য্য ! এত কাল

যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা সফল হইল; আমি যে চিৎ-স্বরূপ, তাহা আজি জানিতে পারিলাম; আজি আমার আত্মলাভ হইল। আমি সেই অনন্ত আত্মা; এই পরমাত্মারূপী আমার অন্ত নাই। যেমন মুক্তাহারের সূত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই গ্রথিত—সম্বদ্ধ, সেইরূপ এই ভগবান্ আত্মা—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বায়ু প্রভৃতি নিখিল ভূতসমূহে সম্বদ্ধ। এই নির্ম্মলা চিতিশক্তি চেত্যরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত; চেত্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। চিতিশক্তি নিখিল দিক্চক্র পূর্ণ করিয়া ভীষণ আকারে অবস্থান করিতেছেন। অথচ ইনি সর্ব্বভাবের অনুগতা অতিসূক্ষ্মা; কিন্তু ইহাঁতে ভাব অভাব কিছুই নাই। ইনি আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল-ভুবনের অন্তরে অবস্থিত; এই নিখিল শক্তির পেটিকা-স্বরূপিণী। ইনি সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা ও নিখিল-বহুপ্রকাশবিষয়ে প্রদীপরূপিণী। এই চিতিশক্তি নিখিলসংসাররূপ মুক্তাকলাপের বিস্তৃত তন্তুস্বরূপা; ইনি সর্ব্ববিধ আকৃতি-বিকৃতিতে পরিপূর্ণা; অথচ ইহাঁর কোনপ্রকার আকার নাই। ইনি নিখিলভূত-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বভাবপ্রাপ্তা; ইনি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে চতুর্দ্দশভুবনের চতুর্দ্দশপ্রকার ভূতসমূহ ধারণ করিতেছেন; ইনি নিখিলজগৎকল্পনাস্বরূপা ও বেদনাত্মিকা। এই সুখদশা উক্ত চিৎশক্তির মিথ্যা আভাসমাত্র; এই পরমা চিৎই আমার আত্মা এবং জগদ্ব্যাপী। এই চিৎই আমার বুদ্ধিসাক্ষী; ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক "আমি রাজা" এবংবিধ ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছেন। এই চিতির প্রসাদেই মন দেহরথে আরূঢ় হইয়া সংসার-জালে লালা-সহকারে চলিত, বল্গিত ও নর্ত্তিত হইতেছে। এই শরীরাদি বস্তুতঃ কিছুই নহে; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরাদি নষ্ট হইলে, কিছুই নষ্ট হইবে না। সাক্ষীরূপিণী চিতিই বুদ্ধিরূপ দীপশিখা দ্বারা এই জগৎজালময় ব্যাপী চিত্তনটের নৃত্য সম্পাদন করিতেছেন। এযাবৎ

প্রজাবর্গের নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিষয় লইয়া মদীয় দেহে বৃথা চেষ্টা হইতেছিল। কারণ দেহ কিছুই নহে। অহো! আমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি; আমার সে দুর্দ্দৃষ্টি গিয়াছে; যাহা দ্রষ্টব্য, তৎসমস্তই দৃষ্ট হইয়াছে; যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সমস্তই পাইয়াছি। এই যে জগদ্গত নিখিলদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে চিতির মায়ায় জীবভ্রম, তাহার অভ্যন্তরে সপ্তদশ লিঙ্গশরীরভ্রম, তাহার মধ্যে বাহ্য অন্তঃকরণে বিভেদ-ভ্রম ও তাহার অভ্যন্তরে জাগ্রৎস্বপ্ন দৃশ্যভ্রম—এই ভ্রম-পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই শাশ্বত বস্তু নাই অর্থাৎ ইহা অংশ। অংশ করিয়া বিচার করিলে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই ইহাতে নাই। সুতরাং ইহাতে নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও হর্ষ-ক্রোধ কোথায় কি প্রকারে কি স্বরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাত দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে আবার সুখ কি? দুঃখই বা কি? এই সমস্তই ত একমাত্র বিতত-ব্রহ্ম। আমি এযাবৎ বৃথা মোহমগ্ন ছিলাম; ভাগ্যক্রমে আমার এক্ষণে সে মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। পরমানন্দরূপে অনুভূয়মান এই একমাত্র ব্রহ্মে শোকের বিষয়ই বা কি? আর মোহের বিষয়ই বা কি? দর্শনীয়ই বা কি? করণীয়ই বা কি? অবস্থিতিই বা কি ও গমনই বা কি? (এ সকলের কিছুই ইহাতে সম্ভবে না)। এ সমস্ত অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। হে তত্ত্ববিহীন সুন্দর চিদাকাশ! ভাগ্যক্রমে অদ্য তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আহা! আমি এক্ষণে সম্যক্ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভও হইয়াছে; সম্যক্‌জ্ঞানলাভে আমি অনন্ত হইয়াছি; আমাকে আমি নমস্কার করি। আমি উপাধিবিরামহেতু স্থির সুষুপ্তিকলায় একীভূত হইয়া বিগতরঞ্জন ও নির্ব্বিষয়ভাবে সংসার-ভ্রমশূন্য রঞ্জনাবিবর্জ্জিত আত্মার আত্যন্তিক অভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছি।"

বৎস, এইবার বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ে কিছু বলিব। "প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে। প্রকৃতি হইতে পুরুষের উদ্ধারকেই বলে মুক্তি। প্রকৃতির হাতে পড়িয়া পুরুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মমহত্ত্ব হারাইয়া ফেলেন। ভুলিয়া যাওয়াই হারান। আবার স্মরণে চৈতন্য হয়; তাহাই পাওয়া। আত্মা বা পুরুষকে আপনার স্বরূপ স্মরণ করানই মুক্তির প্রথম কার্য্য। পুরুষ আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়া জীবাত্মাতে পরমাত্মার ধ্যান করুন। ধ্যানেই মুক্তি। ধ্যানেই আত্মা স্মরণ করেন; তিনিই পরমাত্মা! আত্মার স্বরূপ স্মরণ করায় কে?

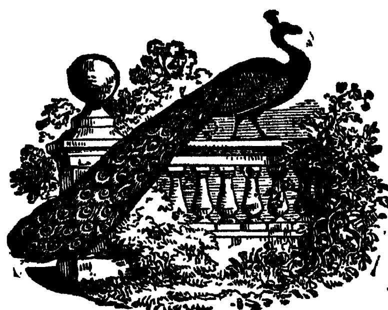
মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমুক্তয়োঃ।

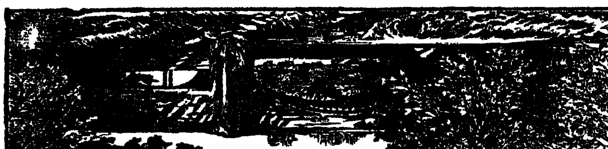
প্রকৃতির বিকারই মন। জীব এই মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মন দুই অবস্থা লাভ করিতে পারে। জীব মনদ্বারা বদ্ধ হইলেও আপন স্বরূপ ভুলে না। জীবাত্মা যখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে অভিমান করেন, তখন সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনকে বৈরাগ্য উপদেশ দেয়,—"রে মন! সমস্তই ক্ষণস্থায়ী জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন কর।" ইহা বুদ্ধিযুক্ত আত্মার উপদেশ। মন বৈরাগ্যযুক্ত হইলে আবার আত্মাকেই তাঁহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়; আর বিষয়-যুক্ত হইলে আত্মাকে সর্ব্বদা সুখে দুঃখে চঞ্চল করে। আত্মা সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও অহং অভিমানে আপনাকে সুখী দুঃখী ভাবনা করেন। সাধকের কার্য্য— **প্রথমে মনকে বৈরাগ্যে উপদিষ্ট করা।** যত দিন বৈরাগ্য দ্বারা মন বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহার না করে, তত দিন উপদেশ করা চাই। কি দেখিবে, কি চাহিবে, কিই বা শুনিবে? সব ভোগই ত করিয়া দেখিয়াছ; দুঃখ ভিন্ন সুখ ত পাও নাই। তবে আর কেন? বিষয় দেখা ছাড়; একবার আত্মাকে দেখ। প্রথমে বৈরাগ্য-বিষয়ক উপদেশ দ্বারা বিষয়ে অনাস্থা জন্মাইয়া নিজের স্বরূপ স্মরণ করাও, আত্মদর্শন কর। এই আত্মদর্শন জন্য প্রথম কার্য্য—**শ্রবণম্** বেদান্ত

বা উপনিষদ্-বাক্যে আত্মার কথা শ্রবণ কর; পরে যুক্তিদ্বারা তাহা যে নিশ্চয়, তাহা স্থির কর। ইহা হইল **মনন**। শ্রবণ ও মনন ঠিক হইলে হইবে **ধ্যান**। ধ্যান অর্থে এখানে আত্মভাবে স্থিতি। আর এক প্রকার ধ্যান আছে; যোগী ইহার অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানী আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া আত্মদর্শন করেন। ইহা উপরকার ক্রম। যোগীর ক্রম নিম্ন হইতে। চিত্ত বিষয় লইয়া থাকে বলিয়া প্রথমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ও উপেক্ষা অভ্যাসদ্বারা সুখে মিত্রভাব, দুঃখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা-ভাবনা কর। মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস দ্বারা চিত্ত ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হইবে না,—একভাবে একটা প্রসন্ন অবস্থায় থাকিবে। পরে প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে চঞ্চলতা-শূন্য কর; পরে প্রত্যাহার দ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাস করাও। যতবার বিষয়ে যাইতে চাহিবে, ততবার ইহাকে বৈরাগ্য স্মরণ করাইয়া বিষয়-বিমুখ কর। চিত্ত যখন আর বাহিরে যাইতে চাহিবে না, তখন ইহাকে শরীর-মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক-প্রদেশে—যেমন নাভিচক্রে বা হৃদয়পদ্মে বা নাসাগ্রে বা ভ্রূমধ্যে অথবা হৃদয়কমল-মধ্যবর্ত্তী ভগবৎ-মূর্ত্তিতে বন্ধন কর। ইহাই হইল ধারণা। চিত্তকে সর্ব্বদা ধ্যেয়বস্তুতে বন্ধন কর। হৃদয়-পুণ্ডরীকে যে শূন্য আকাশ আছে, তাহাতে সগুণ-ব্রহ্ম চিন্তা করিতে হয়। ইহাই দহর বিদ্যা। ধারণা গাঢ় হইলেই ধ্যান। গাঢ়ধ্যানই—সমাধি। সমাধি-ভঙ্গে শ্রবণ, মননও নিদিধ্যাসনে মুক্তি। মুক্তি হইলে প্রকৃতি আর ভুলাইতে পারিবে না। প্রকৃতি আপনার পুরুষকে মুগ্ধ করিতে কত হাব-ভাব' দেখাইবে, কত চেষ্টা করিবে; আর পুরুষ দেখিবে, শুনিবে, সব করিবে সত্য; কিন্তু এ দেখা-শুনায় আর মুগ্ধ হইবে না। বেশ্যার ভিতরটা একবার দেখিয়া ফেলিলে, বেশ্যা যেমন আর মুগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ। প্রকৃতির যা কিছু কার্য্য সকলই ক্ষণস্থায়ী, সমস্তই দোষযুক্ত। ইহা দেখিলে আর

প্রকৃতিকে ভাল লাগিবে না। একদিকে আপনাকে আপনি দেখার সুখ অনুভূত হইতেছে; আর এক দিকে কাপড়ে—বেশভূষায় ব্যাধিগ্রস্ত বেশ্যা দেখা হইতেছে; আর পুরুষ মুগ্ধ হইবে কিসে? যখন আপন সুন্দরস্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, তখন আত্মধ্যানে সমাধি। আবার সমাধি ভাঙ্গিলে ব্যাধিগ্রস্ত বেশ্যা ভিন্ন দেখার কিছুই নাই। কাজেই আবার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বরূপদর্শন। এইরূপে

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥”





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"কর্ম্ম"।

গুরু।—বৎস! এক্ষণে কর্ম্মসম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"ষট্‌পদার্থবাদী বৈশেষিক কর্ণাদ কর্ম্মকে তৃতীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে ভাষা পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় পদার্থরূপে কর্ম্ম। পরিদৃশ্যমান জগতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত নানাবিধ পদার্থ উপলব্ধি করা যায়; ঐ বিচিত্র ভাবের প্রতি কর্ম্মই একমাত্র কারণ। এ বিষয়ে সাঙ্খ্যকার ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন; যথা—"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ স্থষ্টিবৈচিত্র্যং"। করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, অভিনিবেশ, প্রভৃতি কোনরূপ কর্ম্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে না। ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" তিনি সৃষ্টি-সময় হইতে প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত ভূত-প্রপঞ্চ ও জন্মমরণশীল জীবজন্তু সকলকেই সমভাবে দৃষ্টি করিতেছেন,—পাপী ও পুণ্যাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।" করুণাময় ভগবান একাই সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলেন এবং সৃষ্টি হইতে সৃষ্টবস্তুর বিনাশ-সময় পর্য্যন্ত সৃষ্টবস্তুসমূহে সমভাবে দৃষ্টি রাখিয়া

সকলকে পালন করিতেছেন। এ কথা যদি সত্য হইল, তবে শরীর-ধারী জীবসমূহ সমভাবে সুখ দুঃখ লাভ করিতেছে না কেন? কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থ, কেহ সুন্দর, কেহ বা কুৎসিত হয় কেন? কেহ বাঞ্ছিত ফললাভে সর্ব্বদা শান্তি অনুভব করিয়া শরীরযাত্রা শেষ করিতেছে; আবার কাহারও ভাগ্যে দেখিতেছি জন্মাবধি জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখেরই অনুভূতি। অধিক কি, বহুলোক নিরন্তর নানাবিধ তাপে উত্তপ্ত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরে দোষারোপ করিতেছে। সুতরাং দোষবির্জ্জিত ভগবানের রাজ্যে এই সকল বৈষম্যভাব দর্শন করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারের ঐ কথাই সত্য—"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যং।" অর্থাৎ কর্ম্ম বহু, এই জন্য সৃষ্টিও বহুতর। কর্ম্ম নানারূপে অবস্থিত, এই কারণ সৃষ্টজগৎও নানরূপে অবস্থান করিতেছে। কর্ম্ম অনাদি ও অনন্ত; সুতরাং কর্ম্মজনিত সৃষ্টি-প্রবাহেরও আদি অন্ত নাই। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি জীবগণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশতঃ নানারূপে নানাভাবে বিভক্ত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ জন্মপরিগ্রহ করিতেছে; আমি উত্তমশরীরবিশিষ্ট মানব—স্ব-ইচ্ছায় নানাবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছি। যে দিকে দুঃখ, সে দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুখের দিকে বারংবার অগ্রসর হইতেছি। শীত-উত্তাপ-জনিত ক্লেশ নিবারণের জন্য কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, এবং তাহাতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছি। বৃক্ষাদির এ সকল তাপ হইতে উদ্ধার পাইতে কোনরূপ চেষ্টা করিবার অধিকার নাই; পরন্তু অচল-অটলভাবে অবস্থান পূর্ব্বক উহারা শীত তাপ প্রভৃতি জনিত বহুতর দুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহার একমত্র কারণ—পূর্ব্বজন্মের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম।

মানবগণের মধ্যে কেহ অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়. আবার কেহবা দীর্ঘজীবন লাভ করে; ইহারও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই এক মাত্র কারণ। এ বিষয়ে পাতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"ক্লেশ মূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়ঃ সতি মূলে তদ্বিপজ্জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" এই বাক্যে সকল কর্ম্মের স্বরূপ যতদূর প্রকাশিত হইল, তাহাতে বুঝিতে হইবে, যে কর্ম্মকে মহাত্মা কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ পদার্থনিরূপণ-প্রসঙ্গে তৃতীয় পদার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই কর্ম্মই অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। অদৃষ্ট—জীবের ধর্ম্মবিশেষ। যদ্বারা বস্তর স্বরূপ রক্ষা হয়, তাহাকেই তাহার ধর্ম্ম বলে। জীবাত্মাতে যে সকল শক্তি বা গুণ নিহিত আছে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যেরূপ বহ্নির ধর্ম্ম—দাহিকাশক্তি, জলের ধর্ম্ম—শীতলতা, সেইরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মজনিত অদৃষ্টও জীবাত্মার একটি ধর্ম্ম। এই কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম হইতে জীব উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই ত্রিবিধগতি প্রাপ্ত হয়। পরিদৃশ্যমান সৌরজগতে যে সমস্ত ভৌতিক রাজ্য অথবা গ্রহ-উপগ্রহ আমরা অনুভব করি, ঐ সমস্তই জীবের ভোগসাধনস্থান। কর্ম্ম হইতেই জীব ঐ সকল স্থানে পরিভ্রমণ করে। কর্ম্মের দ্বারা যখন যে স্থানে যাইবার উপযুক্ত হয়, তখন সেই স্থানেই যায়।"—ব্রাহ্মণসমাজ।

"শিক্ষার উপাদান শুধু বস্তু-জগতে নিবদ্ধ হইলে শিক্ষার অঙ্গহানি হয়। আধ্যাত্মিক শিক্ষা—ভক্তির দ্বার দিয়া শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। চাই ভক্তি; দেশের প্রতি ভক্তি, দশের প্রতি ভক্তি, রাজার প্রতি ভক্তি, আপনার প্রতি ভক্তি; আর—সকলের চেয়ে বড়—চাই—ভগবানের প্রতি ভক্তি। এই ভক্তির অর্জ্জনেই হ'চ্ছে শিক্ষার চরিতার্থতা, জ্ঞানলাভের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধি, কর্ম্মীর কর্ম্মিত্ব। যে সঙ্কীর্ণ অর্থে জ্ঞান ও ভক্তি, শিক্ষা ও শ্রদ্ধার কথা এ প্রবন্ধে প্রয়োগ করিয়াছি, সে অর্থে জ্ঞান ও ভক্তি না থাকিলে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। জ্ঞান হচ্ছে কর্ম্মের

নয়ন, আর ভক্তি তার হৃদয় বা মন। নয়ন মন ও ছাড়া জীব চরাচরে দেখিয়াছ কি? এই তিনের সামঞ্জস্য না ঘটিলে কর্ম্ম করা আর না করা সমান। কর্ম্মত্যাগের কথা তোমরা বহু বহু শুনে থাক। আমাদের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ একেবারে অসম্ভব। বস্তুতঃ কর্ম্মত্যাগ তাঁরই সাজে —**কর্ম্ম যাঁরে ত্যাগ করেছে,—যাঁর মন সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা পরামৃষ্ট হয় না,**—সংসারের দ্বন্দ্ব যাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন ফাঁকা জিনিষ। বড় বড় সাধকের পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির জন্য, ধ্যান-ধারণার সহজ সাধনের জন্য, কর্ম্মের বিধেয়তা শাস্ত্রে উপদিষ্ট রয়েছে। তবে কর্ম্মত্যাগ কথাটার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে—কর্ম্মফলত্যাগ—ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ। ভক্তের আত্মসাধনা —"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" অথবা সাধক কবি রামপ্রসাদের "যা শিখাও মা তাই শিখি" শ্রেণীর পোষা-পাখীর বুলি—এরূপ আত্ম-সমর্পণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।"

বৎস! কর্ম্মসম্বন্ধে আরো সংক্ষেপে জানাইতেছি। মহাত্মা লোকনাথ বসু তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম মর্ম্মে এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি।

"মুক্তির অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা চঞ্চল, এবং সমল মনে উদিত হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্ব্বাতদীপ-তুল্য সুস্থির করা পরমেশ্বরের উপসনার কর্ম্ম, এবং মনোমালিন্য সম্যক্-রূপে পরিষ্কারকরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল করা ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নহে। অপিচ সেই যে দৃঢ় ভক্তি, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হয়।

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা (যাহাকে পূজা বলা যায়) নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ করার নামই উপাসনা।

যে বস্তু কখনও চক্ষুগোচর হয় নাই, ও যাহার আকার-প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই, এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না, এবং কোনদেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সকলেই তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অস্মদাদির ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চিৎ, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও ব্রহ্ম এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যান-ধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি আছে? সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া, তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথম কৌশল,—পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরিচ্ছিন্নভাবে দারুস্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এহেতু আত্মোপসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়। যেমন কোন মান্যব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান-ধারণাদি সাধনা সম্পাদনের নিমিত্ত আত্মার এক এক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার দোষ উপস্থিত, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্য মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরুকরণপূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্যনাম লাভকরত ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাহারই চিন্তা এবং মানসপূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কৌশল,—অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই; অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি

তাঁহার পদপাদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে; এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার সৃষ্টি হইয়াছে।

"সাধারণ বিবেচনায় শুচি মনোমালিন্য করাই বোধ হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা সারগ্রাহী, এজন্য তাহাকে যোগাঙ্গস্বরূপে গণনা করিয়াছেন। তুমি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে, স্থূলদেহের সহিত মনের এতাধিক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়েই একধর্ম্মাক্রান্ত এবং বাস্তবিক তাহাই বটে; যেহেতু উভয়ের জড় পদার্থ। অতএব স্থূলদেহের অপবিত্রতায় মনের অশুচি এবং তামসিক আহারে, তাহার তমোগুণের বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে স্থূলদেহের পবিত্রতায় মনের শুদ্ধি জন্মে, এবং সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের প্রভাব হয়; সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধাচার এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

"ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্দের প্রথমাধ্যায়ে (১২) দ্বাদশ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্ত্তন, তাহাদের সহিত ক্রীড়া ও দর্শন, তাহাদের সহিত নির্জ্জন স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্টপ্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে। ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হয়। কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা, এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে আদ্যোক্ত দুইটি মুমুক্ষুজনের সম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্যজ্য; যেহেতু কাম্য কর্ম্মবন্ধের হেতু হয়, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ জন্মায়, এজন্য তাহার

অনুষ্ঠানে সকলেরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। উপাসনা কর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বেই কহিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট তিন কর্ম্মের কথা মাত্র বলি। সন্ধ্যা-বন্দনাদি, স্নান, তর্পণ, প্রত্যহিক ইষ্টপূজা, স্মৃত্যুক্ত একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্র্যাদি ব্রত, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম্ম, যাহার অকারণে প্রত্যবায় হয়, তাহার নাম **নিত্যকর্ম্ম**। পুত্রজন্মাদি নিমিত্তক জাত্যেষ্টি প্রভৃতি মৃতপিতৃমাত্রাদি বন্ধুজনের আদ্য শ্রাদ্ধ-তড়াগাদি খনন ও উৎসর্গ এবং সেতু-বন্ধনাদি তান্ত্রিক বার্ষিক পূজা ইত্যাদি কর্ম্মের নাম **নৈমিত্তিক**। **প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম** তাহাকে বলা যায় যাহা পাপক্ষয়ার্থে কৃত হয়, যথা চান্দ্রায়নাদি ব্রত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক এবং শারীরিক হানি-কর বলিয়া ষড় রিপু সংজ্ঞায় গণ্য হয়, তাহারা এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, অহঙ্কার, মমকার, নিন্দা, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, কপটতা, সংশয়, অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, ইত্যাদি যে সকল মনোবৃত্তি নীতিশাস্ত্রেও দূষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনের মল জানিবে। ঐ সকল অসদ্বৃত্তি যে পাপজ, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মে—যাহার মধ্যে তপস্যাও গণ্য হইতে পারে—ঐ পাপ ক্ষয় হইয়া মনোমালিন্যের মূলোৎপাটন হইবার সন্দেহ কি আছে? অপর, নিত্য-নৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে অর্থাৎ শুদ্ধ তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। যেহেতু তিনি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা প্রযুক্ত অন্তরের ভাবমাত্র গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে সুতরাং মনের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব। যেহেতু তিনিই মনের নিয়ন্তা। অতএব ঐ প্রসন্নতার ফলে ঈশ্বরে যে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, তাহার সংশয় নাই। কেন না যে কর্ম্মে সুফলপ্রাপ্তি হয় তাহাতেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা সর্ব্ব-লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অপর ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি হইলে অসৎ বৃত্তিরা

কোথায় উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হইবে? বিশেষতঃ মনের কুপ্রবৃত্তি সকল রজঃ এবং তমোগুণজনিত। ঈশ্বরে নৈষ্ঠিকি ভক্তির উদয় হইলে ঐ রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বের প্রভাব হয়; তাহাতেও অসদ্‌বৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা।"

বৎস, পূজনীয় বঙ্কিম বাবু মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গীতা ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "শুচি ও কুটুম্ব-পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যার দ্বারা কার্য্য সাধন হইয়া থাকে তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান মাত্র পিপাসার শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালের যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন ধর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; স্রোতস্বতীসকল কর্ম্মবলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ

ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এবং অপ্রমত্ত চিত্তে, ভোগবিলাস বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ, এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্ম প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। মহর্ষিগণ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন”। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানযোগে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করাইবার জন্য উদ্ধৃত করিলাম—“যদিও সদসৎ উভয়ই আত্মার খণ্ডপ্রকাশ মাত্র, তথাপি অসদ্ভাবই আত্মার বাহ্য-আবরণ, আর সদ্ভাব মানুষের প্রকৃতস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ অসতের স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে পঁহুছিতেই পারিবেন না ; আর যতদিন না তিনি সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট পঁহুছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পঁহুছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে ; অতি সামান্য কর্ম্ম-ভুক্ত জীবনের কার্য্যের অতি-সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ শুভ কর্ম্মেরই বেগ। যতদিন অসদ্বেগ একেবারে রহিত হইয়া না যাইতেছে যতদিন পূর্ব্ব অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া না যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং যিনি আত্মার নিকট পঁহুছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূতজীবনের শুভসংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস

করিলেও এবং অনবরত কর্ম্ম করিলেও তিনি কেবল সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন; তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্য্যই করিয়া থাকেন; তাঁহার মন কেবল সৎচিন্তা করিতে সমর্থ; তিনি উপস্থিতিই। তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্ব্বত্রই মানব-জাতির মহা-কল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন অসৎ কর্ম্ম কি সম্ভবে? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যক্ষানুভূতি "এবং শুধু মুখে বলার" ভিতর বিস্তর প্রভেদ! অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতা পক্ষীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায়, প্রভৃতি কিছু মন্দ নহে; কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে, ও সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাও। সুতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদিগকে উহা আর বুঝাইবার জন্য ন্যায় যুক্তি তর্ক বিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" এই কার্য্যটী যেমন বৃহত্তম ও মহত্তম, উহার উপকরণও তেমনি কঠিন, বহু জন্মে বহুতর নিত্যনৈমিত্তাদি সৎকর্ম্মই ইহার উপকরণ। মহাত্মা পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন—

আড়া আড়া জলের কথা পাঞ্জি আছে লেখা।
নিঙ্গড়াইলে পাঞ্জিখানি বিন্দু যায় না দেখা॥
তেমনি রকম ধর্ম্মকথা শাস্ত্রে আছে লেখা।
সাধন ভজন না করিলে পাতা ঘাঁটা মিছা॥

শিষ্য। সাধন কাহাকে বলে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। মহাত্মা লোকনাথ বসু লিখিয়াছেন,—"দশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা। তাহা চারি প্রকার, যথা,—

১। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক।

ব্রহ্মাই নিত্যবস্তু, তদ্‌ভিন্ন সকল বস্তু অনিত্য—এই প্রকার বিবেচনা।

২। ইহা মূত্র ফল ভোগ বিরাগ।

যেমন কর্ম্ম জন্য প্রযুক্ত ঐহিক মাল্যচন্দনাদি বিষয়ভোগ সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগ সকলও কর্ম্মজন্য হেতু অচিরস্থায়ী, অতএব তাহা হইতে সুতরাং নিবৃত্তি।

৩। সম-দমাদি সাধন সম্পত্তি।

সম—ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ; এবং দম— শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি।

৪। মুমুক্ষুত্ব।—মোক্ষেচ্ছা।

জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটী সাধনচতুষ্টয় নামে খ্যাত আছে। কিন্তু সম-দমাদির অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে; তাহা এই ঃ—(১) উপরতি অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, অর্থাৎ অননুষ্ঠান। (২) তিতিক্ষা, শীতোষ্ণাদি সহন। (৩) সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণাদিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়ে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা। এবং (৪) শ্রদ্ধা, অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বচনে বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসকেও এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে। ঐ সকল অঙ্গের নাম, (১) যম, অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ও অপরিগ্রহ। (২) নিয়ম অর্থাৎ শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরে প্রণিধান। (৩) আসন অর্থাৎ হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষ যথা পদ্মাসন প্রভৃতি। (৪) প্রাণায়ম অর্থাৎ রেচক, পুরক, কুম্ভকরূপ, প্রাণ দমন করিবার উপায়। (৫)প্রত্যাহার

অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ। (৬) ধারণা অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তকরণের অভিনিবেশ। (৭) ধ্যান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ; এবং (৮) সমাধি। ঐ সমাধি দুই প্রকার;—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক সমাধি, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলা যায়।" যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে যে, সংসার-বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্ম ও আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সে ব্যক্তির কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় নষ্ট হয়; তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্ত্যজের ন্যায় পরিত্যাগ করে। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জনকারী এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথিসেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্য-নৈমিত্তিক মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে এবম্ভূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়। ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, একজন সাধক তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে---পরমাত্মাকে আপনার হৃদয়ে না জানিবে (অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে), সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর যখন বুঝিবে যে, আমি পরমাত্মা সর্ব্বপ্রাণীতে বাস করিতেছি, তখন সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাকেই দানে, মানে ও মৈত্রভাবে অর্চ্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন, করিবে। ভগবান মনু লিখিয়াছেন:—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

৫

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

তিন ঋণ শোধ করিয়া মোক্ষে মন দিবে, কারণ তিন ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষে মন দিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মতঃ পুত্র উৎপাদন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞকর্ম্ম করিয়া পরে নিঃশ্রেয়স্‌ভাবে মোক্ষলাভ করিতে তৎপর হইবে।

বৎস! যজ্ঞ পঞ্চপ্রকার; এবং সেই পঞ্চযজ্ঞ কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা জানাইতেছি! ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিভোজনম্।

অধ্যাপন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞের, তর্পণকার্য্যের দ্বারা পিতৃযজ্ঞের, হোম দ্বারা দেবযজ্ঞের, বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতযজ্ঞের এবং অতিথিপূজা দ্বারা নৃযজ্ঞের সাধন হয়।

কি প্রকার কর্ম্ম করা উচিত তাহাও ভগবান বলিতেছেন :—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসোযথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাং স্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনি লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জাতিভেদ।

(গুণ বা বর্ণভেদের আবশ্যকতা।)

শিষ্য।—কর্ম্মসম্বন্ধে বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু বর্ণ-ভেদের আবশ্যকতা কি, এবং গুণ কি, তাহা কয় প্রকার, এবং কি গুণ থাকিলে আত্মদর্শন সম্ভবে, বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস! মহাত্মা লোকনাথ বসু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তোমায় বুঝাইবার জন্য এই স্থানেই উদ্ধৃত করিলাম:—"মুক্তি-সাধনের পক্ষে বর্ণবিভেদ অনিবার্য্য জানিবে; যেহেতু জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাদি তাবতেরই জন্ম স্ব স্ব জাতিতে হয় এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এ প্রযুক্ত একের ধর্ম্ম অন্যে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না। যথা বানরের হস্তে খন্তা, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব সাত্ত্বিক লোকের ঔরসে তামস সন্তান এবং রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা। সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা মাতার গুণই সন্তানে বর্ত্তে। ব্রাহ্মণের জন্ম সত্ত্বগুণাধিক্যে ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজোগুণের প্রাধান্যে হয়। শূদ্রের তমোগুণই প্রবল; আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে বৈশ্যের উৎপত্তি। উহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান

উৎপত্তি এবং উচ্চবর্ণ নীচের অন্নভোজন করিলে আদ্যের উত্তম গুণের হ্রাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

বর্ণবিচারের দুইটী প্রয়োজন আছে ; প্রথম,—বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আহারাদির নিয়ম পরিত্যাগে যথেচ্ছাচারী হইলে, মনের পুনর্ব্বার মালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়,—সাধারণ লোকে উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের অনুগামী হয়। অতএব যদি জ্ঞানীগণ জাতিবিচার পরিত্যাগ করেন, তবে কাহারও তদ্বিচার করা সম্ভব নহে ; সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে।

(ক) হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব :—

"আর্য্যজাতীয় তীক্ষ্মনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ ॥

পদার্থ সাতপ্রকার ; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও অভাব। "সামান্য" পদার্থেরই নামান্তর "জাতি" পদার্থ। জাতির লক্ষণ এই—

নিত্যা-অনেক-সমবেতা জাতিঃ।

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং যাহা অনেক সংখ্যক পদার্থে সমবেত অর্থাৎ যাহা এককালে একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহার নাম "জাতি"। তাৎপর্য্য এই যে, জাতিশব্দে শ্রেণী বুঝায় একবিধ একাধিক পদার্থকেই শ্রেণীশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। আর এই দৃশ্যমান জগৎ একাধিক দ্রব্য ও একাধিক গুণাদির সমষ্টি ; সুতরাং যাবৎ জগৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ ঐ জাতি বা শ্রেণী পদার্থ বিলুপ্ত

হইবে না। এই নিমিত্ত জাতিপদার্থ নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ জাতি পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—"পরা" অর্থাৎ সাধারণ জাতি, এবং "অপরা" অর্থাৎ বিশেষ জাতি।

ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ
ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ।

যে জাতি পদার্থ ব্যাপক অর্থাৎ বহুব্যাপী তাহা পরাজাতি, এবং যাহা ব্যাপী অর্থাৎ অল্পব্যাপী, তাহা অপরা জাতি।

দ্রব্য-পদার্থ ও গুণ-পদার্থের ইতরবিশেষই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি পদার্থ উৎপন্ন হইবার কারণ। রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয়িত-রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুইটী পরমাণু-সমষ্টির গুণ একবিধ, তিনটী পরমাণু সমষ্টির গুণ অন্যবিধ। এইজন্য ঐ দ্বিবিধ পরমাণু-সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত। সচেতন জীবদিগেরও আহারের ইতর-বিশেষ এবং ব্যবহার্য্য জলবায়ুর ইতরবিশেষ দ্বারা শারীরিক পরমাণু-দিগের অন্যথাভাব অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; ইহাও শারীরবিধান শাস্ত্রের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনুষ্যমাত্রের শরীর যে একবিধ বা একপরিমিত পরমাণুতে নির্ম্মিত, ইহা বলিবার উপায় নাই। অতএব "দ্রব্যভেদে" মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত হইয়াছে। যেমন নীলপীতাদি বর্ণ এবং অম্লমধুরাদি রস ইত্যাদি গুণ-ভেদে অচেতন দ্রব্য-পদার্থের শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ সর্ব্ববাদিসম্মত, সেইরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে সচেতন জীবদিগের জাতিভেদ অপরিহার্য্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।"

বৎস! সত্ব, রজ, রজস্তম ও তম এই গুণগুলি দ্বারা মানব পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম করিয়া সদসদ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া

কথিত আছেন; রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমপ্রধান বৈশ্য, এবং তমপ্রধান ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া কথিত আছে, যথা—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগু´ণৈঃ॥

গীতা।

হে পরমন্তপ! এই স্বভাবপ্রভব গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম বিভক্ত হইয়াছে।

বৎস! মানবগণ আপন আপন গুণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম করিয়া এই সংসারে মায়ামোহ-বিজড়িত হইয়া যায়; আবার সেই শ্রেষ্ঠগুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরে পরমপদ লাভ করে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥

সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-যোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে। আর যদি কেহ তমোগুণ-পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয়। বৎস, আজকাল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে মহামহিমান্বিত অনেক ব্রাহ্মণ-দিগকে কেবল ব্রাহ্মণবংশজাত বলা চলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলা চলে না। কারণ ব্রাহ্মণের যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা একটিও ব্রাহ্মণে পরিলক্ষিত হয় না। তাহারা কেবল ঐহিক সুখাভিলাষে মত্ততাপ্রযুক্ত প্রকৃত বিষয়

হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মহাস্বেচ্ছাচারী হইয়া যায়, অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা মগুপানে রত থাকিতে এবং শূদ্রাণীর সহবাসে রত থাকিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ থাকে; পরোপকার যে কি, তাহা জানে না, এবং সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত থাকে। বৎস! কুলিন ব্রাহ্মণদের যে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় নয়টি গুণ থাকার দরকার, আজকাল তাহার একটিও উক্ত ব্রাহ্মণে লক্ষিত হয় না, বরং গর্ব্বটিই প্রবল দেখা যায়। কুলম্ অর্থাৎ বংশং অস্য অস্তীতি কুলিন। সম্প্রতি জগতীতলে কুলিন শব্দটি অন্বর্থ হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই; যেহেতু আধুনিক কুলিন মহাশয়গণ অর্থগৃধ্নু হইয়া বহুবিবাহ করিতেছেন। কিন্তু বৎস! ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কি কি কর্ম্ম যখন জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার হওয়া দূরের কথা পুত্রকলত্রাদির উপর অনাসক্তি জন্মিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণের কি কি কর্ম্ম, তাহা ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।

মনঃসংযম করাকে শম বলে। দশবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করাকে দম কহে। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক ক্রিয়াকে তপ কহে। যাঁহার দ্বারা অপকৃত হইলেও মনোবিকার হয় না, তাহাকে ক্ষমা কহে। বেদের প্রকৃত রহস্যবোধ হওয়াকে জ্ঞান কহে। অন্তর্জ্জগতের অনুভূতি বা মানসিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান থাকাকে বিজ্ঞান কহে। বৎস, ব্রাহ্মণের এসব কর্ম্ম না করিলে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ব্রাহ্মণের আচারেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কেবল ব্রাহ্মণ-বংশজাত হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় না। কারণ মহাভারতে কথিত আছে,—

ন যোনির্ণাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণং।

বনপর্ব্ব।

জন্ম কিম্বা সাকারেতে. কিম্বা বেদ-অধ্যয়নে অথবা ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-কারণে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় না,—কেবল ব্রাহ্মণের আচারেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বৎস! ইহাতেই সম্পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমস্ত বিষয়ের অনুষ্ঠান (কর্ম্ম) করাই প্রধান। কেবল পুস্তকপাঠে সমস্ত হয় না। কারণ, দেখা যায় যে, অনেকে সামান্য বিদ্যায় হিন্দুর অনন্তশাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে দুই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণভাবে উৎকর্ষতা সাধন না করিয়া, লেখনীসম্ভূত কতক শ্লোক উদরসাৎমাত্র করিয়া জনসমাজে পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করে, আপনাকে মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রচার করে, এবং বাহ্যতঃ প্রকৃতমর্ম্মদর্শীর আত্মোৎকর্ষতা ব্যক্ত করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করে। সুতরাং পুস্তক পাঠ করিয়া উপদেশগুলির মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান কর। আচারহীন ব্রাহ্মণ-গণের বেদপাঠ পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ করিতেছেন। যথা,—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাং স্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ॥
আচারহীনস্য তু ব্রাহ্মণস্য বেদাঃ ষড়ঙ্গাস্ত্বখিলাঃ সযজ্ঞাঃ॥
কাং প্রীতি মুৎপাদয়িতুং সমর্থা অন্ধস্য দারাইব দর্শনীয়াঃ॥

বশিষ্ঠ-সংহিতা।

মান্যবর গিরীশবাবু ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

"ছয় অঙ্গসনে বেদ করি অধ্যয়ন।
পবিত্র না হয় অনাচারী যেই জন॥

জাতপক্ষ পক্ষী নীড় ত্যজে যেইমত।
মৃত্যুকালে ত্যজে তারে ছন্দোগণ যত॥
অন্ধের হইলে যথা সুন্দরী কামিনী।
নয়নরঞ্জিনী তাঁর নাহি হন তিনি॥
সেরূপ ষড়ঙ্গ বেদ যজ্ঞের সহিত।
অনাচারী ব্রাহ্মণের নাহি সাধে হিত॥"

সর্ব্বভূতং হিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিদ্ দ্বিজং।
মৈত্রিং হি সর্ব্বভূতেষু ব্রাহ্মণঃ সোত্তমঃ স্মৃতঃ॥

সকল প্রাণীর হিতসাধন করা, কাহারও দ্বারা অপকৃত হইলেও তাহাদের অহিত না করা এবং সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করাই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। বৎস! মহাভারতে লিখিত আছে, "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য, দান ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি, ইহাই ঋষিবাক্য।

রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন,—"বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা ও অনৃশংসতা, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতে শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্র বংশ-সম্ভূত হইলেই যে শূদ্র হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে উহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" শাস্ত্রেই আছে,—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

গৌতম-সংহিতা।

হে রাজন! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সাত্বিক কর্ম্ম ও জ্ঞান কাহাকে বলে, ভগবান তৎসম্বন্ধে গীতায় লিখিয়াছেন, যথা ঃ—

নিয়তং সঙ্গরহিতম্ রাগদ্বেষতঃ কৃতং।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে॥

কামনারহিত পুরুষ মঙ্গলশূন্য ও রাগরোষাদি বর্জ্জিত হইয়া যে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্বিক কর্ম্ম।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকং॥

গীতা।

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বস্থানব্যাপক এক অব্যয়-সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান।

বৎস! ব্রাহ্মণগণের অহঙ্কার ত্যাগ করা সম্পূর্ণভাবে উচিত। দীনতা স্বীকার না করিলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্বয়ং ভগবান্ অকাতরে ভৃগুমুনির পদাঘাত সহ্য করিয়া, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, তিনি তৎক্ষণাৎ মুনিবরের শ্রীচরণে কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যিনি জগতের পালক, তিনিও সমস্ত সহ্য করেন; সুতরাং তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করা সম্পূর্ণভাবে উচিত। দীনতা স্বীকার না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রেই আছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হরি-সংকীর্ত্তনের তিনিই যোগ্য ব্যক্তি যিনি তৃণ হইতে সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু এবং যিনি অমানীকেও মান দিতে পারেন।

বৎস! আহারের সহিত ধর্ম্মের অনেক সামঞ্জস্য আছে, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে বলিয়াছেন,—"আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতেও আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়; সুতরাং আমাদিগের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ॥
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহ, সুখযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। অতিকটু, অতি-অম্ল, অতিলবণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতিবিদাহী, এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসগণের অভিলষিত। বহুক্ষণের পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসিকদিগের প্রীতিকর।

রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম কি, তাহাও জানাইতেছি; শ্রবণ কর ঃ—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥

—গীতা।

সকাম ও অহঙ্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল-আয়াসকর কর্ম্মরাজসিক॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং॥

—গীতা।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান প্রভুত্ব, এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম॥

অনুবন্ধ ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্য চপৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥

ভাবী অশুভক্ষয়, হিংসা, পৌরুষ ইত্যাদি বিচার না করিয়া অবিবেক বশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তাহাই তামস্।

কৃষি গৌরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥

—গীতা।

কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়টি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম, এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম।

রাগী, কর্ম্মফলং প্রেপ্সুর্লুব্ধোহিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—গীতা।

অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসম্বলিত কার্য্যই রাজসিক।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

—গীতা।

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাণমাণী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক॥

বৎস! সত্ত্বগুণসম্পন্ন না হইলে, যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা যায়, সবই ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। দুই এক পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ভাবিও না। কার্য্য কর। যখন দেখিবে যে তোমার মন পবিত্র হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারিতেছ, তখনই জানিবে যে এবারে ভগবানকে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছ।

অভয়ং সত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাভিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

— গীতা।

মান্যবর পাত্র মহাশয় ইহার সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা—

"সত্ত্বোল্লাসে সংশুদ্ধতা অভয়ত্ব নির্ম্মলতা,
জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দান॥
দম, শম, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায় আর্জ্জব তপ॥
তন্ময়তা তদ্ভাব তদ্ধ্যান॥
অহিংসা অক্রোধ ত্যাগ সত্যনিষ্ঠ বীতরাগ,
অপৈশুন শান্তি উদারতা॥
দয়া প্রাণী-সমুদায়ে নির্ল্লোভ বিষয়চয়ে,
মার্দ্দব হ্রীং বীতচপলতা॥
দ্বন্দ্ব-দ্রোহ-বিশূন্যতা অভিমান-বিহীনতা,
তেজ ক্ষমা ধৃতা শৌচ আর॥

হে ভারত এই সব সত্বগুণে সমুদ্ভব,
ইহা দৈবি-সম্পদ হিয়ার ॥”

এই পুত্র-কলত্রাদি পরিজনবর্গ এবং সকল প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাঁদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একাকী আমি কিরূপে জীবিত থাকিব,—এইরূপ ভীতির উদয় না হইয়া, প্রত্যুত উহাতেই একপ্রকার উৎসাহবিশেষের নাম **অভয়**। অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে আত্মতত্ত্ব-পরিস্ফুরণের উপযুক্ততাই **সত্ত্ব-সংশুদ্ধি**। আত্মতত্ত্বাদি-প্রকাশক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া যে সংস্কারবিশেষ জন্মে, তাহাকে **জ্ঞান** বলে। সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আত্মতত্ত্ব অনুভবের নিমিত্ত চিত্তৈকাগ্রতার অভ্যাস করাকে **যোগ** বলে। আপন পরিজন এবং সৎপাত্রে যথাশক্তি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়াকে **দান** বলে। বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, ঋতু-কালাদির অতিরিক্ত কালে স্ত্রী-সংস্পর্শাদির অভাবকে **দম** বলে। দেবতাদের উদ্দেশে এক এক ক্রিয়াবিশেষকে **যজ্ঞ** বলে।

যজ্ঞ চারিপ্রকার; যথা দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ দেবতাদের উদ্দেশে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা হয়, তাহাই দেবযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিকে পিতৃযজ্ঞ বলে। কাক ও কুক্কুরাদি প্রাণীকে অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ; এবং অতিথি-সৎকারকে মনুষ্য-যজ্ঞ বলে। অপিচ ভগবান মনু অধ্যাপনকে একটি যজ্ঞ বলিয়া পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, আত্মোন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক উহাদের নিগূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করাকে **স্বাধ্যায়** বলে। শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক যে একরূপ ক্রিয়াবিশেষ আছে, তাহার নাম **তপ**। অবক্র স্বভাবকে “**আর্জ্জব**” বলে। কোন প্রকার প্রাণী-বিনাশের হেতু না

হওয়াকে **অহিংসা** বলে। কাহারও দ্বারা আক্রোশ বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া যে তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত বৃত্তিবিশেষে বিজৃম্ভিত হওয়ার নাম "**অক্রোধ**।" সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করাকে **ত্যাগ** বলে। মন জয় করার ক্ষমতাকে **শান্তি** বলে। পরোক্ষে পরদোষাদি কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিকে পৈশুন বলে; সেই বৃত্তি সংযত করার ক্ষমতার নাম **অপৈশুন**। সর্ব্বদা ভোগ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষে থা কলেও তাহাতে আসক্ত না হওয়াকে **নির্লোভ** বা **অলোলুপতা** বলে। স্ত্রী, বালক, অল্পবুদ্ধি ও কুলোকদ্বারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে পারাকে **তেজ** বলে। অপকারীর অপকারে সামর্থ সত্তেও শান্ত থাকার ক্ষমতাকে "**ক্ষমা**" বলে। যথাবিহিত কার্য্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্য্যযুক্ত রাখিবার যত্নবিশেষকে "**ধৃতি**", বলে। ধন-প্রয়োগাদিতে মায়া ও অনৃতাদি না থাকাকে **শৌচ** বলে। বৎস! এইগুলি মহামহিমান্বিত সত্বগুণশালী ব্যক্তিগণের কর্ম্ম, অর্থাৎ পূজনীয় ব্রাহ্মণ-দেবগণের কর্ম্ম।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

আত্মতত্ত্ব।

গুরু।—বৎস! এইবার আত্মসম্বন্ধে তোমায় সংক্ষেপে জানাইব, অর্থাৎ তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আত্মা কি এইবার—তাহাই তোমায় বুঝাইব। প্রথমে ভগবান শঙ্করাচার্য্য শান্তি, তিতিক্ষা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছি।

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিষয়ে যে বৈরাগ্য তাহাকে **নির্ম্মল বৈরাগ্য** কহে। আত্মা নিত্য ও দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ অনিত্য—এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকে **উত্তম-বস্তুবিবেক** কহে। বাসনা-ত্যাগ ও বাহ্যবৃত্তি-নিগ্রহকে **দম** কহে। বিষয় হইতে পরাবৃত্তিকে **পরমা উপরতি** কহে। সকল প্রকার দুঃখ-সহনকে **তিতিক্ষা** কহে। তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী। বেদ ও গুরুবাক্যে ভক্তিকে **শ্রদ্ধা** কহে সংলক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতার নাম **সমাধি**। ভগবান শঙ্করাচার্য্য আরো বলিয়াছেন যে,—নির্ব্বিকার চিত্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলপ্রকার প্রপঞ্চভাবের পরিবর্জ্জনকেও সমাধি কহে। কি প্রকারে কখন সংসার-বন্ধন মোচন হইবে—এই যে সুদৃঢ় বুদ্ধি, তাহাকে **মুমুক্ষুতা** কহে।

প্রাণবায়ু পাঁচটী—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। শিবসংহিতায় আরও পাঁচটীর উল্লেখ আছে; যথা—নাগ, কূর্ম্ম,

কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয়। তন্মধ্যে পূর্ব্বকথিত পাঁচটীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাতটী,—মন, বুদ্ধি এবং শোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী—হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য ও লিঙ্গ। সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃতভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্মশরীর জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু হইয়া থাকে। কোষ পাঁচটী—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।

বপুস্তুষাদিভিং কোষৈর্যুক্তংযু'ক্ত্য বঘাততঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা॥

ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

দেহ কথন আত্মা হইতে পারে না; কেন না উহা মৃত্তিকা, জল, বায়ু, ইত্যাদি জড়পদার্থ সমূহের সমষ্টিমাত্র। উহা অনিত্য এবং অস্থায়ী পদার্থ; কখন আছে, কখন ছিল না, এবং কখন থাকিবে। প্রাণসমূহও আত্মা নহে; কেন না উহা বায়ুবিশেষ মাত্র, সুতরাং উহাও জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মনকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না; কেন না কামাদি রিপুর প্রাবল্য হইলে উহার বিকার জন্মে। বুদ্ধিবৃত্তিও আত্মা নহে; কেন না সুষুপ্তি-সময়ে উহার কার্যকারিতা থাকে না, উহা অবিদ্যাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির প্রলয় এবং উৎপত্তি ইত্যাদি অবস্থা হয় বলিয়া বুদ্ধিকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যে কারণ শরীর আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আত্মা হইতে পারে না; কেন না তাহা সমাধিকালে বিদ্যমান থাকে না, উহা সমাধিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব **উল্লিখিত পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন এবং বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত্মাশব্দের বাচ্য হইতে পারেন।** অতএব এস্থলে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব এইরূপ হইতেছে:—ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিবার যে প্রণালী আছে, অর্থাৎ তুষাদিতে আবৃতশরীর ধান্যাদিকে তুষাদি

ত্যাগ করাইয়া তাহা হইতে যেমন বিশুদ্ধ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবঘাত দ্বারা দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং
যো বিদধাতী কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী
নেতরেষাং ॥
—কাঠকোপনিষৎ

যিনি অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবান্‌দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যশান্তি; অপরের নহে। বাহ্যজগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য্য, চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে?

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রস্তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি
কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভ্রান্তমণুভাতি সর্ব্বং তস্য তাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥
—কাঠকোপনিষৎ।

যেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায়? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অনুপ্রকাশিত; তাঁহারই দীপ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে।

ঊর্দ্ধমূলস্তধঃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রস্তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।

যেরূপ লোকে তূলা-দর্শন নিবন্ধন শাল্মল্যাদি বৃক্ষের মূল নির্ণয় করে, তদ্রূপ সংসার-রূপ বৃক্ষের দর্শন নিবন্ধন তাহার মূলকারণ ব্রহ্মের অবধারণার্থ এই ষষ্ঠী বল্লী আরম্ভ করিতেছেন।—এই সংসার-রূপ তরু ঊর্দ্ধমূল, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদই এই তরুর মূল। এই সংসার-তরু প্রতিক্ষণেই জন্ম, মরণ, জরা ও শোকাদি অনেক অনর্থ দ্বারা অন্যথাভাবে পরিণত হইতেছে। কদলীস্তম্ভ যেরূপ অসার বস্তু, এই সংসার-তরুও তদ্রূপ অসার পদার্থ, এই সংসার-তরুকে লক্ষ্য করিয়া অনেকশত পাষণ্ড বহুবিধ বিকল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তাঁহারা ইহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সক্ষম। পরম-ব্রহ্মই এই তরুর মূল, ইহা বেদান্ত-বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবিদ্যা-জনিত কামনা ও কর্ম্মাদিই এই তরুর বীজ, এবং জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্ত্যাত্মক হিরণ্যগর্ভই ইহার প্রথম অঙ্কুর; নিখিল প্রাণিপুঞ্জই স্কন্ধ। এই বৃক্ষ নিরন্তর তৃষ্ণারূপ জলাশয় দ্বারা সিক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি ইহার প্রবাল; শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদেশই পত্র; এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি অনেক ক্রিয়াসমূহ ইহার সুন্দর পুষ্প। প্রাণীর সুখদুঃখাদি বেদনাই বহুবিধ রস। এই তরুর মূলদেশ ফল-তৃষ্ণারূপ জলসেক দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সত্যাদি নামক সপ্ত-লোকে ব্রহ্মাদিরূপ বিহগবৃন্দ এই তরুতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণিবৃন্দের সুখদুঃখজনিত হর্ষশোকাদিদ্বারা জাত নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং হাহাকারাদি অশেষ শব্দরাশি দ্বারা এই সংসার-তরু সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত, বেদান্তশাস্ত্র-বিহিত আত্ম দর্শন-জনিত অসঙ্গতা-রূপ শস্ত্রই ইহার উচ্ছেদে সক্ষম। এই সংসার-তরুর কাম-কর্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা নিয়ত অশ্বত্থ-বৃক্ষের ন্যায় বিচলিত-স্বভাব; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্-প্রেতাদি ইহার শাখা। এই তরু অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত। যে দ্রব্য এই সংসার-তরুর মূলীভূত, তাহাই শুদ্ধব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম ব্যাপক এবং অবিনাশিস্বভাব।

এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্যাদি সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে। ইহাঁকে কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। হে নচিকেতঃ! ইহাই পরমব্রহ্ম জানিবে॥ ১॥

বৎস! সেই চিদানন্দস্বরূপ আত্মা কিরূপ ভাবে নির্লিপ্ত আছেন, তাহাও বলিতেছি।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

—গীতা।

এদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি সর্ব্বদা স্বতন্ত্র কারণ—তিনিই উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্ত্তা, ও ভোক্তা মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।

যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না, কিন্তু নিকটে থাকিয়া সাক্ষী স্বরূপে সমস্ত অবলোকন করেন, তাঁহাকে "উপদ্রষ্টা" বলে। আত্মার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতিদ্বারা সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির সহিত আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ থাকাতে, প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া ও ব্যাপার সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে; তাহাই আত্মার অনুভব করা। সুতরাং আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়াসকলের উপদ্রষ্টা হইলেন। অন্যকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কোন কার্য্যে প্রতিপক্ষভাব না থাকিয়া যাঁহার সন্তোষভাব থাকে, তাঁহাকেই সেই কার্য্যের "অনুমন্তা" বলা যায়; কিংবা পরকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কার্য্যে নিজে অপ্রবৃত্ত থাকিলেও যদি তাহার আনুকূল্যে প্রবৃত্তি হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে সেই কার্য্যের অনুমন্তা বলে; এবং অন্যকর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কার্য্য যদি সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া তাহাকে নিবারণ না করে, তাহা হইলেও তাহাকে ঐ কার্য্যের অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষ-ভাব নাই, কেন না আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। নিষ্ক্রিয় পদার্থের প্রতি পক্ষতাচরণ অসম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে এক প্রকার ক্রিয়া হওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদয় স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে—অর্থাৎ আত্মা তাহার অনুভূতি করেন; তাহাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষবিশেষ বলা যাইতে পারে। অতএব দেহেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির কার্য্যে আত্মাকে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। আত্মার স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার সহিত অতিঘনিষ্ঠতম সংযোগবিশেষ থাকাতেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধজড়পদার্থগুলি চৈতন্য লাভ করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। নতুবা উহাদিগকে ঐ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিয়াই জড়পিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় অনিয়মিত অসম্বদ্ধভাবে কার্য্য করিতে হইত। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে আত্মা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি ইহার আনুকূল্য করিতেছেন—ইহা বলিতে পারা যায়; সুতরাং এই ভাবে আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যের অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ আত্মার যখন কোন ক্রিয়া নাই, তখন দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাঁহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতম, সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদিগকে কোন কার্য্যে নিবৃত্ত করিতে পারেন না, সুতরাং করেনও না। অতএব, এই ভাবে আত্মাকেও দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে অনুমন্তা বলা যাইতে পারে। একমাত্র আত্মা বা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষই সৎপদার্থ; এব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই বাস্তবিক অসৎপদার্থ। ভ্রান্তিপ্রভাবে যেরূপ সর্পে রজ্জু বোধ হয়, সেইরূপ ঐ অবিদ্যাপ্রভাবে একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতেই ঐ দেহ মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরিস্ফুরণ হইয়া দৃষ্টি হইতেছে। আত্মা না থাকিলে ইহাদের পরিস্ফুরণ হইতে পারিত না। অতএব আত্মাকে

দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ধারয়িতা বা ভর্ত্তা বলা যাইতে পারে। বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থের মধ্যে যে সকল সুখ, দুঃখ, মোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; সেই প্রকাশের নামই অনুভূতি বা ভোগ। এই অনুভূতি আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আত্মাকে "ভোক্তা" বলা হয়। আত্মা স্বাধীন এবং সর্ব্বাত্মস্বরূপ। ইনিই অতীব মহান্ ও সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তাই "মহেশ্বর" বলিয়া অভিহিত হন। ইনি দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পদার্থ; এই জন্য ইঁহাকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারে।

শিষ্য।—আত্মা সম্বন্ধে যাহা বুঝাইলেন, তাহা অতি মধুর বোধ হইল। এক্ষণে এই আত্মা-দর্শন কি প্রকারে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু।—বৎস! ভগবান গীতায় তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কোচিদাত্মানমাত্মনা
অন্যে সাঙ্খ্যেনযোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে।

গীতা।

কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যাগত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেহ কেহ বা সাঙ্খ্যযোগ দ্বারা এবং কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মা-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

উক্ত আত্মতত্ত্বদর্শনের চারিপ্রকার উপায় আছে; তন্মধ্যে একটী মুখ্য উপায়, দ্বিতীয়টী গৌণ উপায়, আর একটী গৌণতর উপায় এবং চতুর্থটী গৌণতম উপায়। আবার এই সংসারেও আত্ম-জ্ঞানদর্শনেও চারিপ্রকার অধিকারী ব্যক্তি আছেন। কেহ উত্তম অধিকারী, কেহ মধ্যম অধিকারী, কেহ মন্দ অধিকারী, আর কেহ বা মন্দতর অধিকারী। ইহার মধ্যে যিনি উত্তম অধিকারী

তিনি মুখ্য উপায়, যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি গৌণ উপায়, যিনি মন্দ অধিকারী তিনি গৌণতর উপায়, এবং যিনি মন্দতর অধিকারী তিনি গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করেন। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলির প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনে লয় করিতে হয়; মনকে আবার অভিমানে বিলয় করিতে হয়; অভিমানকে বুদ্ধিতত্ত্বে বিলীন করিতে হয়; বুদ্ধিকে প্রকৃতি-তত্ত্বে বিলীন করিতে হয়; পরে প্রকৃতিও আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। তখন কেবল এক অদ্বিতীয় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সমস্ত ক্রিয়াগুণ ও কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত চৈতন্যময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আর কিছুরই অস্তিত্বের ভান হয় না। এইরূপ অবস্থাকে ধ্যান বলে। এই ধ্যানই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায়। আর যাঁহার সুখ দুঃখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁহার সুখজনক ঘটনায় কিছু মাত্র আনন্দোচ্ছ্বাস হয় না, আবার দুঃখজনক কোন ঘটনা হইলেও অণুমাত্র ম্লানভাব হয় না, সুতরাং যাঁহার সুখভোগের নিমিত্তও কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, আবার দুঃখভোগের আশঙ্কায়ও কিছুমাত্র ভয় বা বিদ্বেষাদি নাই; যাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার জড়বস্তুতেই আত্মত্ব বোধ নাই, অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বলিয়া যিনি আত্মাকে জানেন, সুতরাং এই দেহটা অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অথবা অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইলেও "দেহ আত্মা নয়" বলিয়া যিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত না হয়েন এবং মন বা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যত প্রকার সুখদুঃখাদি সমুৎপন্ন হয়, তাহার কোনটিকেই যিনি আপনার সুখদুঃখাদি বলিয়া অনুভব করিয়া বিচলিত না হয়েন; যিনি শত্রুমিত্রাদিতে সমদর্শী, ইত্যাকার লক্ষণযুক্ত মহাত্মাকে উত্তম অধিকারী বলা যায়। ইনিই ঐ পূর্ব্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের) অবলম্বন করিয়া, তাদৃশ ধ্যান-পরিসংস্কৃত চিত্ত দ্বারা, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড

যেরূপ তাপদ্বারা অনুস্যূত থাকে, সেইরূপ অনুস্যূতভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে আপন অন্তঃকরণমধ্যে সন্দর্শন করেন।

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞানকে গৌণ বলা যায়; অর্থাৎ দেহমধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে তৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রাণাদি জড়পদার্থের ক্রিয়া—উহা আত্মার ক্রিয়া নহে; কারণ আত্মা নিতান্ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্ম, চৈতন্যময় পদার্থ; তাঁহার কোন প্রকার ক্রিয়াদি কদাচ সম্ভবে না;—তিনি সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থিত আছেন;—সুখদুঃখাদি কোন প্রকার গুণ তাঁহার নাই;—ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃত পুরুষ-বিবেক বলে। ইহারই নাম সাঙ্খ্য-যোগ (কিন্তু পূর্ব্বের সাঙ্খ্যযোগ হইতে ইহা বিভিন্ন); এইরূপ বিচার করাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মদর্শনের কারণ বলা যায় না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের অনুশীলন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের ক্ষমতা বিকশিত হইতে পারে; তৎপরে সেই ধ্যানদ্বারা আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এইজন্য বিচার ও বিবেককে আত্ম-দর্শনের গৌণ উপায় বলা গিয়া থাকে। আর যাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভাব নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উত্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাঁহাদিগকে মধ্যমাধিকারী বলা যায়। সেই মধ্যমাধিকারীগণ উক্ত গৌণ উপায় (প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। এবং ঐরূপ বিবেকের (সাঙ্খ্যযোগের) অনুশীলন করিতে করিতে অবশেষে ধ্যানসম্পন্ন হইয়া পরিসংস্কৃত চিত্ত দ্বারা আপন অন্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক ফল-কামনা-শূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকে গৌণতর উপায় বা **কর্ম্মযোগ** বলা যায়। আর যাঁহাদের চিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই, পূর্ব্বোক্ত ধ্যান ও বিবেকের অবস্থাও যাঁহাদের জন্মে নাই, তাঁহারা মন্দ-

অধিকারী। মন্দ অধিকারীগণ গৌণতর উপায়ের (ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক ফলকামনাশূন্য হইয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাদৃশকর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত রজোগুণ এবং তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। চিত্ত তখন আত্মতত্ত্ব-বিবেকের উপযুক্ত হয়। ইহাকেই "চিত্তশুদ্ধি" বলে। পরে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তই আত্মদর্শন করে।

পরমাত্মার বিবরণ।

বৎস! কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন,—"প্রস্তাবিত ব্রহ্মপদার্থ যদিও স্বয়ং কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন, তথাচ তাঁহার সন্নিধিমাত্রে চুম্বকের লৌহাকর্ষণ ও অগ্নির বারুদিয় পদার্থের বিস্ফোরণরূপ ক্রিয়োৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতির বিক্রিয়া দ্বারা বিশ্ববস্তুর নানাপ্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব উক্ত ব্রহ্মপদার্থকে যখন সচেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের প্রবর্ত্তকতা শক্তির সহিত ব্যপদেশ করা যায়, তখন তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত হয়েন। তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকেক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে॥
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ॥

অর্থাৎ এই সংসারমধ্যে ক্ষর অক্ষর নামক দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণিসমূহের শরীর ও তৎকারণ পৃথিব্যাদি ভূতসকল ক্ষর (নশ্বর) পুরুষ, এবং কূটস্থ অর্থাৎ জীবোপাধি যাহা দেহনাশেও নষ্ট হয় না তাহা অক্ষর (অনশ্বর) পুরুষ বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ ক্ষরাক্ষর উভয় পুরুষ হইতে ভিন্ন ও

তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ যিনি লোকত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবসকলের বুদ্ধি ও অজীব বস্তুর স্বভাবকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, তিনিই **পরমাত্মা** নামে খ্যাত হয়েন। এই পরমাত্মার উক্ত শক্তি দ্বারা বিক্রিয়াপ্রাপ্তা প্রকৃতি হইতে অন্তঃকরণপ্রধান লিঙ্গশরীর উদ্ভূত হইয়া বহ্নির সন্তাপে তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় তাঁহার চৈতন্য দ্বারা তাহা যখন সচেতন হয়, তখন তাহাকে **জীবাত্মা** বলা যায়। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ, নতুবা অন্য কোন প্রভেদ নাই। উক্ত পরমাত্মাকেই সাক্ষি-চৈতন্য কহে। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে সচেতন করেন এবং যে চেতনা হইতে বিষয়সঞ্চার হয়, তিনিই পরমাত্মা। অতএব পরমেশ্বর এই অংশেই জগতের পরমনিমিত্ত কারণ হইয়াছেন।

ভগবানের বিবরণ।

প্রাগুক্ত ব্রহ্মপদার্থের যে প্রদেশে, বিশ্বের প্রকৃতিরূপা তাঁহার তটস্থা-শক্তি আশ্রিতা হইয়া থাকে, সেই প্রদেশ—প্রকৃতির সহিত ব্যপদিষ্ট হইলে, **ভগবান্** অথবা **ঈশ্বর** বলিয়া নিরূপিত হয়েন। উক্ত ঈশ্বর, —মূল কারণ, সূত্র ও কার্য্য এই প্রকার ত্রিবিধরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে যখন তাঁহাতে কোন কার্য্যমাত্রের প্রকাশ থাকে না, তখন তিনি মূলকরণ অথবা বাসুদেব বলিয়া বিবেচিত। উক্ত মূলকারণ, ঘটকার্য্যের প্রতি যে প্রকার পৃথিবী এবং যখন তিনি জীবাদৃষ্টবশতঃ ক্ষুব্ধপ্রকৃতি হইতে পরমাত্মার প্রেরণাশক্তির দ্বারা উৎপন্ন মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রাদি কার্য্যরূপে প্রকাশ হইয়া ঘটকার্য্যের দ্বিতীয় কারণ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় বিশ্বের দ্বিতীয় কারণরূপে গণ্য হয়েন, তখন তাঁহাকে সূত্রাত্মা (দ্বিতীয় কারণ) অথবা **নারায়ণ** বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অপর যখন তিনি বিশ্বকার্য্যের শৃঙ্খলা বর্দ্ধনার্থ ব্রহ্মারূপে

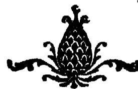
প্রকাশিত হয়েন, পণ্ডিতেরা তখন তাঁহাকে কার্য্যব্রহ্ম **ব্রহ্মা** বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। অতএব প্রকৃতির আশ্রয়ভূত নিগুর্ণ ব্রহ্মই তদীয় গুণের সহিত প্রকাশিত হইলে **ঈশ্বর** নামে খ্যাত হয়েন। অর্থাৎ প্রকৃতির সমুদয় গুণের সহিত অবভাসিত যে ব্রহ্ম, তিনিই **ঈশ্বর**।"

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

যিনি চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধ্বদেশে ও অধোভাগে সর্ব্বত্র স্বকীয় সত্তা এবং জ্ঞান ও আনন্দময়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ যাঁহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ তাঁহার সমান কিংবা তাঁহা হইতে অধিক আছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না; যিনি অনন্ত ও নিত্যকাল বিরাজমান আছেন; যিনি স্বজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুরূপে বিরাজিত হইতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

যিনি বেদান্ত-বাক্য দ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে পরিলক্ষিত হন, অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে,—এই ভাবপ্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিষেধপূর্ব্বক যাহা নিষিদ্ধ নহে স্বয়ং তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, এবং যাঁহা হইতে ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরমআনন্দস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে।





নবম পরিচ্ছেদ।

বেদ ও পুরাণ।

শিষ্য।—আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানের উদয় হইল; কিন্তু বেদে কেবল এক ব্রহ্মই উপলক্ষ মাত্র, অথচ পুরাণাদিতে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনৈক্যের কারণ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর।

"বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিবার উপদেশ মুমুর্ষু জন-গণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্ব্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তিলাভ করিবার বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় দেখাইয়াছেন; যথা, বেদ এই আদেশ করেন যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" অস্যার্থঃ—অরে! আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগের জন্য সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রে উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি-প্রকরণে বিবিধ দেবদেবীর প্রসঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদিগের বাসস্থান ও পরিবার ও বাহনাদি থাকার বিবরণ ও সেই সেই দেবদেবীর উপাসনা করিবার উপদেশ অথবা

উপাস্য দেবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা বেদের আশ্চর্য্য কৌশল জানিবে।

১। পুরাণ শাস্ত্র যে বেদমূলক, তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে, পুরাণ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান যে বেদব্যাস, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, "এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল।" পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশৎ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, "ইহা সর্ব্ববেদের তুল্য"। পুনশ্চ তৎপর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, "মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্মসুত ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।"

এ বিষয়ের প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায়ঃ—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি। অস্যার্থঃ—ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদার্থেরই স্তাবক মাত্র। বেদ অল্পজ্ঞানবিশিষ্টলোক কর্ত্তৃক প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হয়েন। অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করতঃ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারমাত্র স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমানী হয়, তাহারা বেদাধ্যয়ন বা তদালোচনা করিলে, তাহার প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণ করিতে অশক্ত হইয়া অর্থবাদ সকলকেই যথার্থবাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে। এ নিমিত্ত বর্ণাশ্রম এবং অধিকারভেদে ও রাজপ্রজাদির যাহা কর্ত্তব্য, পরম দয়ালু ঋষিরা তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া উপন্যাসচ্ছলে লিখিয়াছেন।

২। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদমূলক, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাতেই লিখিত আছে; যথা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ প্রকরণে এই মনুবাক্য ধৃত হইয়াছে,—"আর্যং, ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদনেতরঃ॥" অস্যার্থঃ—বেদাধিকারী

জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসা দ্বারা বেদ ও স্মৃত্যাদি অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্ম জানে, তদিতরে জানে না।

৩। তন্ত্রশাস্ত্রে বেদ-মূলকতার প্রমাণ এই যে,—

ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রোবেদ সমুত্থিতঃ।
অস্মাৎ বেদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ॥

—ইতি মেরুতন্ত্রে প্রথম প্রকাশে।

অস্যার্থঃ—প্রণব পরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয়; এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদ হইতে; অতএব সমুদায় মন্ত্রই বেদপর অর্থাৎ বেদের মধ্যে উত্তম এবং আগমও বেদের অঙ্গ; এই হেতু মন্ত্রসকল বেদের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে।

অপিচ, নিরুত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ॥"

অস্যার্থঃ।—আগম পঞ্চম বেদ এবং কৌল অর্থাৎ বামাচার পঞ্চম আশ্রম।

বিশেষতঃ তন্ত্রে যে সকল নামরূপ উদ্দেশে উপাসনার বিধান আছে, তত্তাবতের প্রসঙ্গ বেদে এবং পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে; এ বিধায়ে তাহা তন্ত্রকারদিগের স্বকপোলকল্পিত বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ে বেদের সহিত তান্ত্রিক মতের অনৈক্য নাই; যেহেতু বৈদান্তিক মত, যাহার আভাস তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাহা এই যে, জীব বাস্তবিক বিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব, কেবল মায়াচ্ছন্নতাপ্রযুক্ত জীবরূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়াছেন; এবং তন্ত্রেও তাহাই অবিকল লিখিত আছে। যথা :—

"জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥" ইতি—

মুণ্ডমালাতন্ত্র—দ্বিতীয় পটল।

অস্যার্থ। জীবই শিব, শিব দেবতা, এবং সেই যে জীব, তিনি কেবল, অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত শিব; কেবল পাশবদ্ধ হেতু জীব; পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি।—"তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ
কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীব কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ"। ইতি
মুণ্ডমালা তন্ত্র—তৃতীয় পটল।

অস্যার্থঃ।—তুষাচ্ছাদিত যে শস্য, তাহারই নাম ব্রীহি; তুষরহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীব-সংজ্ঞা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয়; এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান সাধনার্থে পূজাপদ্ধতির মধ্যে ভূতশুদ্ধির প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে এমত ভাবনার উপদেশ আছে যে, জীবাত্মা মূলাধারে চতুর্দ্দশপদ্মে অবস্থিত জ্ঞানে সুষুম্ন নাড়ীর পথে তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলনকরতঃ লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল, নাভিমূলে দশদল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, কণ্ঠে ষোড়শদল, ভ্রূমধ্যে দ্বিদল পদ্ম ভেদকরণপূর্ব্বক মস্তকমণ্ডলস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকান্তর্গত দ্বাদশকমলদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগকরতঃ সেই আমি, এই চিন্তা করিয়া পুনরায় জীবাত্মাকে পৃথক্ করণান্তর উক্ত পথে অবতারণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপন করিবে। এতাবতা পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদই জানা যায়; অর্থাৎ বেদ যাদৃশ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশক, তাদৃশ সাকার-অর্চ্চনার এবং বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ সর্ব্বকর্ম্মাদিরও নিবর্ত্তক।

তিনি চিৎ, সৎ আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কুটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি

আছে? সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রথম কৌশল—পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অপরিচ্ছিন্নভাবে দারুস্থিত বহ্নির ন্যায় আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন; এহেতু আত্মোপসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়। যেমন কোন মান্যব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান-ধারণাদি সাধনা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আত্মার এক একরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে পাছে ভক্তির ত্রুটি এবং ব্যভিচার-দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরুকরণপূর্ব্বক উপাস্য বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্যনাম লাভকরতঃ ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানসপূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কৌশল—অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়; এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থান নাই। অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবিদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোনস্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে। এ নিমিত্ত বাহ্যপূজার সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

আমি অব্যক্ত হইলেও, মূঢ় ব্যক্তিরা আমার অব্যয় অনুত্তম পরমভাব অবগত হইতে না পারিয়া, আমাকে ব্যক্তস্বরূপ বিবেচনা করে। আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত রহিয়াছি; সুতরাং মূঢ়েরা অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে প্রকাশ আছে যে, জৈমিনি ঋষি মহাভারতের কয়েক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত-গহ্বরস্থিত পক্ষিরূপী দ্রোণপুত্র-চতুষ্টয়কে অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাসা করেন যে, "ভগবান বাসুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ। তিনি নির্গুণ হইয়াও তবে কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? তাহাতে পক্ষীরা উত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপবর্ণন করণান্তর পরিশেষে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে, "তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, কল্পিতমাত্র। সেই মূর্ত্তি অতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান আছে; কেবল ইহাই মান্য করিও।"

পুরাণবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত; তাহাতেও বেদব্যাস উক্ত কল্পনা অপ্রকাশ রাখেন নাই; যেহেতু ষষ্ঠস্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেনঃ—

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥

সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন, যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোকদিগের চিন্তানুরূপ বিবিধ আকারবিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন; যেমত একবায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশাধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে এবম্প্রকারে বিষ্ণুমূর্ত্তি কল্পনার অলঙ্কার স্ফুট করিয়াছেন যে, তিনি যজ্ঞরূপ পুরুষ; শুদ্ধ জীবচৈতন্য (তাঁহার বক্ষঃস্থিত) কৌস্তুভমণি; ঐ চৈতন্যের প্রকাশ—শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী; নানাগুণময়ী মায়া বনমালা; ছন্দোময় পীতবস্ত্র; প্রণব যজ্ঞোপবীত; সাংখ্যযোগ (কর্ণের) মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়; ব্রহ্মপদ মস্তক; সত্ত্বগুণ পদ্ম; প্রাণতত্ত্ব গদা; জলতত্ত্ব শঙ্খ; তেজস্তত্ত্ব সুদর্শননামক চক্র; আকাশ-তত্ত্ব অসি; তমোময় চর্ম্ম; কালরূপ ধনুঃ; (সকাম ও নিষ্কাম) কর্ম্মময় তূণদ্বয়; ইন্দ্রিয়গণ শর; ক্রিয়া-শক্তি রথ; বিষয়—রথের প্রকাশ (অভিব্যক্তি); অর্থক্রিয়া—বরাভয়াদি মুদ্রা; ধর্ম্ম এবং যশঃ—উভয় চামর-ব্যজন; বৈকুণ্ঠ (মুক্তি)—ছত্র; বেদত্রয় —গরুড় (নামক বাহন); চিৎশক্তি—লক্ষ্মী এবং অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য—দ্বারপাল। বিষ্ণু-পুরাণের ১ খণ্ডের ২২ অধ্যায়ে ঐ মূর্ত্তির রূপক এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, হরির বিশ্বাত্মত্ব কৌস্তুভমণি প্রধান শ্রীবৎস-চিহ্ন; মহত্তত্ত্ব গদা; অহঙ্কারের একাংশে শঙ্খ ও অপরাংশে ধনু; মন সুদর্শন চক্র, যেহেতু তদ্বৃত্তিসকল ঐ চক্রের ন্যায় বায়ু অপেক্ষা দ্রুত গমন করে; পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চরত্নের বৈজয়ন্তী-মালা; কর্ম্মের ও বুদ্ধির গুণ সকল শর, তত্ত্বজ্ঞান অসি, যাহা কখন কখন অজ্ঞানরূপ চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে। এতাবৎ ইহা বিদিত আছে যে, আত্মা, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সকল, মন, অজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সকলই হরিতে আছে।

মুণ্ডমালাতন্ত্রের সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে:—

শিব উবাচ।—

নিগুর্ণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নিগুর্ণঃ।
যদৈব সগুণা ত্বংহি সগুণোঽহং সদাশিবঃ॥

সত্যং হি সগুণাদেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥

শিব কহিলেন, ইহা সত্য বটে যে, প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া নির্গুণা এবং আমিও নির্গুণ। যে কালে তুমি সগুণা হও, সেইকালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হই। প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য, এবং শিবও নির্গুণ; কিন্তু উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হয়েন।

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠোল্লাসে উক্ত হইয়াছে যে,—

চিণ্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।

জ্ঞানস্বরূপ অপরিমিত নিঃসঙ্গ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপকল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতার্থ।

মহাকাব্য রত্নাবলীতে লিখিত আছে,—

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম্।
সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু॥

বিষ্ণু রক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ এবং সংহারকর্ত্তা মহাদেব ইত্যাদি সকলই মিথ্যা।

মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত; অতএব ধ্যেয়মূর্ত্তির বর্ণনামাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য; সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্রিত, কিংবা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করতঃ পূজা করিলে ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু এ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন; অথচ যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে, জীবিতকালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহে উৎসব

সম্বন্ধে দৃঢ়শাসনও হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেই সেই পূজা-অকরণে প্রত্যবায়রূপ ভয় এবং তৎকরণে স্বর্গভোগাদি মিষ্টফলের প্রলোভন দর্শিত হইয়াছে। ইহাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বীজ জানিবে।

যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাধনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা, ভয় ইত্যাদি নানাকারণ বশতঃ স্ব স্ব উপাস্য বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমার্চ্চনার অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না; যেহেতু নানা-নামরূপ-উদ্দেশে যে পূজা তাহা একেরই হয়; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ সাংসারিক লোকে সময়ে সময়ে আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভোজন এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ না করিয়া কদাচ সুস্থির থাকিতে পারে না; ইহা সভ্যাসভ্য সর্ব্বদেশেই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু শুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে ঐহিক সুখাতিরিক্ত পারত্রিকের উপকারও সম্ভবে।

কোন কোন বাদী এতৎকারণে পৌত্তলিক ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া বলেন যে, মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করায় জগদীশ্বরের বিদ্রূপ করা হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; কিন্তু তাহাতেও অধিকার-ভেদ আছে; অর্থাৎ মলিনচিত্ত লোক—যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় কহিয়া থাকেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক-ধর্ম্মাচরণ চিত্তশুদ্ধিরই কারণ হয়; পক্ষান্তরে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা নাই; অতএব তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥

আমি আত্মাস্বরূপ সর্ব্বভূতে সর্ব্বদাই স্থিতি করিতেছি ; সেই আত্মারূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমাপূজা করে; তাহা বিড়ম্বনা মাত্র।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মনেব্য জুহোতিসঃ ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥

আমি আত্মারূপ ঈশ্বর, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছি ; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাদিতে ভজনা করা ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় বিফল। পরকায়াতে অর্থাৎ অন্যের শরীরে আমাকে দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমানী ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মাদর্শন এবং অপরাপর প্রাণীকে বৈরী জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তি পায় নাই।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতম্ ॥

আমি ঈশ্বর,—আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্ম্মীলোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত আমাকে সে নিজের হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত না জানে।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্ব্বভূতে আত্মারূপে রহিয়াছি যে আমি, সেই আমাকে দানে, মানে, মৈত্রভাবে এবং অভিন্নদৃষ্টিতে পূজা করিবে ; অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমি আছি, এহেতু সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান এবং তাবৎকে মিত্রজ্ঞান করিবে ও সকলকে আত্মতুল্য জানিবে; ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে।

চতুর্থ কৌশল। সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে, লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ ব্যবহারে অন্যের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আত্মবৎ করিবার আবশ্যকতা প্রযুক্ত তাহার সাঙ্গোপাঙ্গি সম্পন্ন করণার্থ স্বীয় কলত্রপুত্রাদি পরিবার ও বাসস্থান যান-বাহনাদি পরিকর-নিকর থাকার ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয়-ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে, তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপিত করিতে হয় এবং চিত্তস্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্টদেবের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্ত্তিতে চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না, এবং ভাব ব্যতিরিক্ত ভক্তির উদয় হয় না। অধিকন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্ত্তির ধ্যান-পরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য। অতএব ধ্যানবর্জ্জিত কাল ব্যর্থ ব্যয় না হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কাল ভগবৎ-কথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং মনন দ্বারা যাপন-করণার্থে তিনি বিবিধ রূপধারণ পূর্ব্বক স্থানবিশেষে এক মূর্ত্তিতে মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করিতেছেন; এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপবিশেষের বিশেষ বাহনও আছে,—এমত বর্ণনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্য পশুপক্ষ্যাদি বাহন থাকার এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তিতে স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"প্রতীক অর্থে যে সকল বস্তু অল্পবিস্তর ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধান।

"অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্।"

ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেন,—মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে,

ইহাই আধ্যাত্মিক; আকাশ—ব্রহ্ম, ইহাই অধিভৌতিক;" মন—আধ্যাত্মিক ও আকাশ—বাহ্য প্রতীক; এই উভয়কেই ব্রহ্মের বিনিময়ে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম—ইহাই আদেশ। "যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন" ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়, শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। প্রতীক শব্দের অর্থ বাহিরের দিকে যাওয়া এবং প্রতীকোপাসনা অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে বা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত কিন্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রুতিবর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণতন্ত্রেও অনেক বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এক্ষণে কথা,—এই ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা, ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে; কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না; উহা মুক্তিও প্রসব করিতে পারে না। সুতরাং একটী কথা বিশেষরূপ মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরমব্রহ্ম হইতে জগৎকারণের উচ্চতর ধারণা আর হইতে পারে না। প্রতীকোপাসনা কিন্তু অনেক স্থলেই এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে পারে; কিন্তু এরূপ স্থলে সেই উপাসককে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণ মাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু

তাহাই নহে। প্রবর্ত্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা অথবা প্রাণীরূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটী কর্ম্ম মাত্র বলা যাইতে পারে।. আর উহা একটী বিদ্যা বলিয়া, উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফললাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণী ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা ঈশ্বরোপাসনার তুল্য-ফল হইয়া পড়ে। উহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই কোন দেবতা বা মহাপুরুষ অথবা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের দেবত্ব প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, কি জন্য তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, "নাম রূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নহে?" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—"সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নহেন?" শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—"আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদির আরোপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাও প্রতীকে আরোপিত হন। প্রতীক সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই সকল কথা খাটিবে; অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুর সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভও হইবে না। কিন্তু উহারা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহারা ভক্তি-মুক্তি উভয়ই প্রসব করে।





দশম পরিচ্ছেদ।

সাকার উপাসনার তাৎপর্য্য।

শিষ্য।—আপনার নিকট তত্ত্ববিষয়ের উপদেশ পাইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইল; কিন্তু আমার মনে কয়েকটি বিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই গুলির ভঞ্জন করিয়া দিউন। আপনি বলিয়াছেন যে "আত্মা-মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবের চরম লক্ষ্য। তিনি নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও চিৎস্বরূপ।" তবে সেই নির্গুণ ব্রহ্মর উপাসনা করিতে উপদেশ না দিয়া তন্ত্রে সাকার, সগুণ উপাসনা করিতে বলেন কেন? সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য ও বহুমূর্ত্তির আবশ্যকতা কি? গুরু-করণেরই বা আবশ্যকতা কি? দেবদেবীর ইষ্টমন্ত্র জপ করিবারই বা তাৎপর্য্য কি? আমাকে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস! তোমায় সবিশেষ জানাইতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইবার কারণ বুঝ। "শক্তিই ব্রহ্ম; দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" ইত্যাদি বেদবাক্যে এই শক্তি ক্রীড়াশক্তি ও আত্ম-শক্তিরূপে আম্নাত; কেন না দিব্ ধাতু ক্রীড়নার্থক এবং আত্মন্ শব্দের অর্থ—সচেতন। এই উভয় শক্তির মধ্যে ক্রীড়া-শক্তি পরিণামিনী এবং আত্মশক্তি অপরিণামিনী। "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং"—এস্থলের স্বগুণ শব্দের

আত্মস্বরূপ গুণাবলীতেই তাৎপর্য্য। সেই গুণ কি কি? জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। নিত্য-সম্মিলিত শক্তিই সমষ্টিরূপে এক। এই ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধে বেদবাক্যও আছে; যথা—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ" ইতি। স্বপ্রকাশময়ী যে শক্তি, প্রজ্ঞাশক্তি বিস্তার করতঃ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, সেই প্রকাশকর্ত্রী এবং প্রকাশ কর্ম্মস্বরূপা জ্ঞানশক্তিই সকল-লোক-ধারণক্ষমা; অতএব তিনিই বলশক্তি এবং এই শক্তিই অংশতঃ পরিণামিনী; অতএব তিনিই ক্রিয়াশক্তি। এইরূপে বলশক্তি ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির সহিত নিত্য-সম্মিলিত হইয়া দেবাত্মাশক্তি নামে আম্নাত। এই ত্রিবিধশক্ত্যাত্মিকা দেবাত্মশক্তি এক এবং স্বপ্রতিষ্ঠা। সেই এক শক্তিতেই পরিণামবতী নানাশক্তি প্রতিষ্ঠিতা। নট যেমন নানাভূমিকা গ্রহণ করিলেও এক, সেইরূপ ঐ দেবাত্মশক্তি নানা পরিণামি-শক্তির স্বরূপ হইয়াও এক। শ্রুতিতেও "পরাস্য শক্তির্ব্বিধেব শ্রূয়তে" ইত্যাদি স্থলে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। সেই পরিণামি-শক্তি শ্রুতি অনুসারে পৃথিবী, পৃথিবী-তন্মাত্র প্রভৃতি ভেদে নানানামে উল্লিখিত আছে। স্মৃতিতেও ঐরূপ "ভূমিরাপোঽনল" ইত্যাদি। ঐগুলি স্থূলভেদ; উহাদের আবার অবান্তরভেদ আছে; যেমন ঘটপট প্রভৃতি ভূমির অবান্তর-ভেদ। মূলশক্তি স্বরূপতঃ অন্য শক্তি-নিচয়ের আধার। এই মূলশক্তিকেই ব্রহ্ম বলা হয়। মহামায়া প্রভৃতি মূলশক্তির নামান্তর। এইরূপেই **শাক্তদিগের স্বরূপা-দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয়।**

"দুর্গাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিতে ইচ্ছা কর—উত্তম। তুমি তখন গীতা দেখিবে—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং;" অর্থাৎ প্রকৃতি আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি বল, প্রকৃতি হইলে তাঁহার উপাসনায় ফল কি আছে? বেদান্তে ত পরমাত্মোপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনা মোক্ষহেতু বলিয়া বিহিত। সংক্ষেপে

ইহার উত্তর শুন; প্রকৃতি—ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা পরমাত্মার শক্তি; শক্তি বা শক্তিমানে ভেদ নাই; যেমন বহ্নির দাহিকা শক্তি বহ্নি হইতে পৃথক্ নহে। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। যে পদার্থ যে পদার্থকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সে পদার্থদ্বয়ে অভেদ-সম্বন্ধ। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। তবে শ্রুতিতে মায়া ও মায়ী এই পদার্থ দুইটীর পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ থাকায় আপাততঃ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক ভেদ নাই। তাহা স্বীকার না করিলে (একমেবাদ্বিতীয়ম্) এই অপর শ্রুতিটি বাধিত হইত।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎসৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত এই দুইটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; মায়া উপাদান-কারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। এই কারণ-বৈলক্ষণ্য বশতঃই মায়া-মায়ীর ভেদ-ব্যবহার; বস্তুতঃ কিন্তু ভেদ নাই। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ সং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারা জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রলয়কালে এই জগৎ ব্রহ্মেই লয় হয়। যদি জগতের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তবে জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয়; সুতরাং ব্রহ্মে বিলীন হয়—এ কথাটি অসঙ্গত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। প্রকৃতিতে যে পদার্থ বিলীন হয়, তাহা ব্রহ্মেই বিলীন হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রকৃতির উপাসনাও ফলতঃ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার উপাসনায় মোক্ষলাভ হইবে না কেন? এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা"। অর্থাৎ মহামায়া আরাধিত হইয়া মনুষ্যগণের ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

বহুমূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা।

"প্রতিমা, লিঙ্গ, ঘট, পট, মন্ত্র ইত্যাদি যিনি যাহাকে আশ্রয় করিয়া পূজা করেন, অথবা এই সকল বাহ্য আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে ধ্যানযোগে যিনি ইষ্ট-দেবতার উপাসনা করেন, সেই সকল সাধক একই ঈশ্বরের উপাসক। ভগবান মানবের প্রতি কৃপা করিয়াই সাধারণের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে নানাভাবে উপাস্য হইয়া থাকেন। অধিকার-ভেদে উপাসকের অবলম্বনমাত্র ভেদ হইয়া থাকে। মানব-প্রবৃত্তির পার্থক্যই বহুত্বের কারণ; ইহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। মানসিক বৃত্তিগুলির একতার অভাবই নানাবিধ ভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, প্রবৃত্তির পার্থক্যের কারণ কি। মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যমাত্রই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট প্রভাবেই হউক, দেশ-কালাদির স্বভাব-প্রভাবেই হউক, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তির নিয়মেই হউক, অনন্তময়ের অমোঘ ইচ্ছাবশেই হউক, উপাদানীভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের পরিণামবশেই হউক, অথবা ইহজন্মের শিক্ষা বা সংসর্গ প্রভাবেই হউক, পরস্পর ভিন্নপ্রবৃত্তিসম্পন্ন। উপাসনা মনেরই কার্য্য; মনের অনৈক্য হেতু উপাসনার অনৈক্য ও একতার অভাব হইয়া থাকে। সমস্ত জগতে যদি একটী মাত্র মন থাকিত, তাহা হইলে উপাসনার প্রকারভেদ কদাপি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না।"—ব্রাহ্মণ-সমাজ।

বৎস! তুমি এইটী মনে রাখিবে যে, মানব আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ দুর্গা, কেহ বা কালীর উপাসনা করে, কিন্তু সকলেই এক ঈশ্বরেরই উপাসক।





একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য ?

গুরু।—বৎস! সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য, তাহাও তোমাকে জানাইতেছি ; শ্রবণ কর।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ সহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা॥

—ভাগবত।

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন) মনুষ্যগণ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার হৃদয়ে না জানিবে (অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে), সে পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর যখন বুঝিবে যে আমি (পরমাত্মা) সর্ব্বপ্রাণীতে বাস করিতেছি, তখন সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাকেই দানে, মানে ও মৈত্রভাবে অর্চ্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন করিবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না

জন্মিবে, তাবৎ অন্তঃকরণের নিশ্চলতা ও নির্ম্মলতা সম্পাদনার্থ মনুষ্যকে সাকার উপাসনা করিতে হইবে।

শাস্ত্রান্তরে নিরাকার উপাসনার অধিকারী-নির্ণয় বিষয়ে আরও স্পষ্টতর নির্দ্দেশ আছে ; যথা :—

“অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।”—বেদান্তসার।

যিনি যথাবিধি বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলরূপে সকল বেদের অর্থ বুঝিয়াছেন, ইহজন্মে ও জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই প্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার পাপ ধ্বংস হওয়াতে অন্তঃকরণকে একান্ত নির্ম্মল করিয়াছেন, এবং নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শমদমাদিসাধন-সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চতুর্ব্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ প্রাণীই (মনুষ্য) ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। স্বর্গাদি ইষ্টকামনায় যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। নরকাদি অনিষ্টসাধন কার্য্যকে নিষিদ্ধ বলা যায়। যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে (যেমন প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ও পিতামাতার প্রতিপালনাদি) নিত্যকর্ম্ম বলে। কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য করা হয় (যথা অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র-কামনায় যজ্ঞাদি), তাহা নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়মাত্র-সাধক কার্য্যকে (যেমন চন্দ্রায়ন) প্রায়শ্চিত্ত বলে। সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের

আরাধনাকে উপাসনা বলে। কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের রাহিত্যকে অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা বলা যায়। ইহকালের নিতান্ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের কিছু অধিকক্ষণস্থায়ী (অনিত্য) সুখের ভোগবিষয়ে বিবক্তিকে ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ বলে। শম (ঈশ্বরের শ্রবণ-মননাদি ব্যতিরেকে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), দম (ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), উপরতি (বিহিতকার্য্যের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে পারা), সমাধান (ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিতে আকৃষ্ট মনের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা (গুরূপদেশ ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন), এই ষড়্‌বিধ কার্য্যকে শমদমাদিসাধনসম্পত্তি বলা যায়। নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, অসংসারী ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ অনিত্যের সংসর্গদোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না। যেমন অশ্ব লঙ্ঘন করিয়া ঘাস গ্রহণ হয় না, তদ্রূপ অপরিসমাপ্তকর্ম্মী কদাচ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে না। পূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্ত হইলে স্বভাবতঃই কর্ম্ম রহিত হইয়া যায়। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সহজেই সুলভ হয়। উপনিষদ্ শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে :—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাৎ।
অপ্রমত্তস্তদাভবতি যোগোহি প্রভাবাপ্যযৌ॥

কাঠোপনিষৎ।

যৎকালে (স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া) মনের সহিত পঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (আত্মাতে) অবস্থান করিবে এবং স্ব-ব্যাপারে বুদ্ধির চেষ্টা না থাকিবে, সেই কালের যে গতি, তাহাকে পরমাগতি কহে। ধারণাদ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের নিশ্চলতারূপা তাদৃশী অবস্থাকেই যোগ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) বলে। তৎকালে অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদবর্জ্জিত হইলে, এই যোগপ্রভাব হয়। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় মহাশয় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—"যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে কর্ম্মকাণ্ডের তাদৃক্ প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্ম্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। উহা কোন মতে ত্যজ্য নহে। কেন না, তৎসাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বথা স্ফূর্ত্তি হয়; বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত-বিধি অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুর্লভ। সকাম সাধনার নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন; যথা :—" অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবে।

বেদের মর্ম্ম এই যে, যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবে, তাবৎ গৃহস্থ থাকিবে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে. অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে, অনন্তর—সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ঋক্‌বেদের অনু-ক্রমণিকাতে লিখিত আছে—

" ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংস সৈব ধর্ম্মঃ। "

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরমহংসেরই ধর্ম্ম।

সুতরাং অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান—সংসারদোষসংসৃষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে। তথাপি যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুশাসনাতিক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞানীদিগের নিকট সে অজ্ঞান, উন্মত্ত ও ভ্রষ্টাচারীরূপে পরিগণিত হয়।

যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কোন সংসারাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি সন্তরণ-কার্য্যে সুশিক্ষিত নহে, সে ব্যক্তি নদী উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ নহে, ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাহাকে নদ্যাদি জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক অবশ্যই সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারাসক্ত ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহে, ইহা সত্য; কিন্তু যদি সংসারে অবস্থানকালে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস না করে, তবে কিরূপে তাহার পরে ব্রহ্মে পারগতা জন্মিতে পারে? দূরদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তারা এরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহাদের মতে যদি সংসারী ব্যক্তির ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতে বাধা নাই। সংসারোচিত কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক যাগযজ্ঞ ও দেবপিতৃকার্য্য ত্যাগ না করিয়া, বৈধাবৈধ বিচার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া, শাস্ত্র-নিষিদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া ও প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সংসারীব্যক্তিও পরিমুক্ত হয়; যথা—

ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

যে ব্যক্তি ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ

ভগবদ্‌বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-সেবাপরায়ণ হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক মাতৃপিতৃশ্রদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে, এবম্ভূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।

এতাদৃশ শাস্ত্র-ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথত্যাগী স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

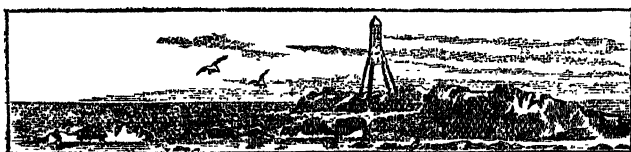
মিথিলাধিপতি জনকাদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড প্রবাহের অবরোধ হয় নাই, বরং তাঁহারা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দা, অপ্রসিদ্ধাহার ও সদাচার পরিত্যাগ, অথবা ব্রত-নিয়মোপ-বাস এবং তীর্থস্নানাদির ব্যাঘাত করেন নাই।

শাস্ত্রান্তরেও এবিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

" বহির্ব্যাপার-সংরম্ভো
হৃদি সংকল্প-বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।

যোগবাশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন, "হে রাম! তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর, মনে সংকল্প-রহিত হও, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। এইরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিও। অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান-প্রশংসা-শ্রবণে ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত করিও না। যেহেতু পরমহংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সংসারী ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে পারে না।"



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গুরুকরণের আবশ্যকতা।

বৎস! প্রথমে জ্ঞান উপার্জ্জন কর; তৎপরে ধর্ম্মকে বিশ্বাস কর; পরে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা মা জগদম্বার উপাসনা কর,—দেখ মুক্ত হইতে পার কি না। সাধক রামপ্রসাদ সংসারে থাকিয়া মায়ের উপর অচলা ভক্তিদ্বারা মুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাস প্রভু রামচন্দ্রের উপর অচলা ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মনকে নির্ম্মল কর; সর্ব্বদা চিন্তা কর যে, একদিন মরিতে হইবে। সেই বিশালনিতম্বা, পূর্ণশশধরবদনা যুবতী পত্নী ও প্রাণসমসন্তানাদি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতে হইবে! যাহাদের জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বার্থের লালসায় দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞান হারাইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি তোমার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেহ নয়,—পথিকের পথিকদর্শন মাত্র। বৎস! এ বিবেক পুস্তকপাঠে হয় না। দিবারাত্র পুস্তক পাঠ কর; কিন্তু তোমার নিত্য সঙ্গী মন, যে সম্পূর্ণভাবে কণ্টকস্বরূপ সংশ্লিস্ট রহিয়াছে, এবং তোমাকে সে দিকে যাইতে দিতেছে না। অবশ্য পুস্তকপাঠে অনেকটা মনের পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু যেমন ক্ষণস্থায়ী শকুনি যতই ঊর্দ্ধ-আকাশে

উঠুক না কেন, লক্ষ্য তাহাদের সারের উপর; সেইরূপ পুস্তকপাঠীদের লক্ষ্য কেবল স্বার্থে। আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব কম লোকেরই হয়। দুই এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লেখনীসম্ভূত কতকগুলি শ্লোক উদরসাৎ করিয়া জনসমাজে পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করে এবং আপনাকে মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রচার করে, এবং বাহ্যতঃ প্রকৃতমর্ম্মদর্শীর আত্মোৎকর্ষতা ব্যক্ত করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করে। সুতরাং পুস্তক পাঠ কর ও তাহার উৎকর্ষতা সাধন কর, তাহা হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। এই বিপথগামী মনকে উদ্ধার কর; কারণ মন সর্ব্বদাই নিম্নাভিমুখী হয়। যেমন জল সর্ব্বদাই নিম্নাভিমুখী এবং ঐ জলকে উন্নত প্রদেশে লইয়া যাইতে হইলে যেরূপ অত্যন্ত পরিশ্রম ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক, মানবের মনও ঠিক তদ্রূপ। তাহাকে উন্নতপথে লইয়া যাইতে হইলে, বহু পরিশ্রম, যত্ন ও সাধন আবশ্যক। মনকে উন্নীত করিতে হইলে ও আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে সৎগুরুর আবশ্যক; গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র সদাসর্ব্বদা জপের আবশ্যক, ও অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সেই ইষ্টদেবতাকে ধনে, মানে, প্রাণে আরাধনার আবশ্যক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নলিনীদলগত জলমতিতরলং। তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

অর্থাৎ পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। এই সংসারে

সাধুসঙ্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। উহাই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে বলিয়াছেন,—"জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে। চরমে সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা যখন যাহা করি, তাহা আমাদের অতীত কার্য্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আর এক্ষণে যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিতেছি, ভবিষ্যতে তাহাই হইব। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া, বাহির হইতে যে, আমাদের কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই,—তাহা নহে; বরং অধিকাংশ স্থলে এরূপ সাহায্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যখন আমরা এই সহায়তা প্রাপ্ত হই—তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে,—আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে। উহার উন্নতি ত্বরিত হয় ও সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়। এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি; খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি; কিন্তু শেষে দেখিব, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু যদি গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিব, বড়-জোর, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু সতেজ হইয়াছে; কিন্তু অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্য্যের সময়—প্রকৃত ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিবার সময় কেন এত ন্যূনতা লক্ষিত হয়? তাহার কারণ—গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে;

জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।

"যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে **গুরু** বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে **শিষ্য** বলে। যিনি শক্তিসঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক; ভূমিও সুকর্ষিত থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়েরই বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃতধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য; শ্রোতারও সুনিপুণ হওয়া আবশ্যক। যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে; অন্য স্থলে নহে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু আর এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু; আর সকলে ধর্ম্ম লইয়া ছেলে-খেলা করে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল—একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে; কিন্তু তাহারা এখন ধর্ম্ম-চক্রবালের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে; কারণ, সময়ে ইহা হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্ম্ম-পিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন—আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার আত্মায় ধর্ম্মালোকাকর্ষিণী শক্তি পূর্ণা ও প্রবলা হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্টা আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।"

বৎস! শিষ্যের পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা, বিশ্বাস ও অধ্যবসায় থাকা আবশ্যক। তৎপরে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, ও ইষ্টদেবতাকে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কার্য্যের ফলাফল সমর্পণ

পূর্ব্বক ঘটে, পটে, হৃদয়ে, সর্ব্বস্থানেই তিনি বিরাজ করিতেছেন ভাবিবে, এবং তাঁহার আরাধনা করিবে। যথা—

বৈরাগ্যং কারণঞ্চাদৌ যত্তবেদ্ বুদ্ধিশুদ্ধিতঃ।
কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাদ্বিশেষং শৃণু কথ্যতে॥
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেন বেদোক্তেন চ কর্ম্মণা।
নিষ্কামেণ সদাচার ঈশ্বরং পরিতোষয়েৎ।
কামসঙ্কল্পসন্ত্যাগাদীশ্বর প্রীতিমানসাৎ
স্বধর্ম্মপালনাচ্চৈব শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বয়াৎ॥

—শান্তিগীতা।

তাঁহার আদি-কারণ—বৈরাগ্য। চিত্তশুদ্ধি হইলে সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়; এবং কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

সদাচারযুক্ত ও বাসনারহিত হইয়া বেদোক্ত বিধানুসারে স্ব স্ব বর্ণ ও স্বাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বার ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। ঈশ্বরের প্রীতিসাধনমানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত চিত্তে স্বধর্ম্ম পালন এবং সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও তীর্থস্থানসমূহ ও যথাবিধি দর্শন ও সেবা করিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়।

অনভিধ্যায়রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্টা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।

—ভগবতী গীতা।

হে পর্ব্বতপ্রবর! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ

কোন প্রকারে জানিতে পারিবে না এবং তাহার অদর্শনে মোক্ষলাভও হইবে না।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চবিধানতঃ।
শনৈ বলাচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্।

—ভগবতী গীতা।

সেইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়াযোগে তাঁহাকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া ক্রমে ক্রমে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিবে।

এইরূপ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপান-স্বরূপ। সেই গুরুপ্রদত্ত দেবতাকে আরাধনা কর ও মন্ত্র জপ কর। কলিকালে মানুষ অল্পবুদ্ধি ও অল্পায়ু হইবে বলিয়া শাস্ত্রে "নাম বা মন্ত্র" ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনে নৈব সর্ব্বস্বাযোপি লভ্যতে॥

—ভাগবৎ।

গুণবেত্তা সারগ্রাহী মহাত্মারা কলিযুগে কেবল নামকীর্ত্তন করিয়া যথার্থ সিদ্ধ হইবে জানিয়া উক্ত যুগের প্রশংসা করিয়াছেন।

মহাযোগী শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র" নামক অতি প্রামাণ্যগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে দেবতাগণ ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণ করিতে পারেন; অতএব আমরা যদি বলি যে, দেবতাগণ মানব হইতে উন্নত জীব, তাঁহারা ঊর্দ্ধ জগতে বিচরণ করেন, তাহা হইলে আমাদের ভ্রম হয় না; কিন্তু এই ঊর্দ্ধজগৎবাসী মানব হইতে শ্রেষ্ঠজীবের সহিত আমাদের বিশেষ

সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ মুখে বলা যায় না; মন্ত্রই সেই দেবতাদিগের সম্বন্ধ বলিবার এক মাত্র উপায় বা সোপান। মন্ত্রবলেই যে কোন দেবতাকে ইচ্ছা করি না কেন আনয়ন বা অধিষ্ঠান করিতে পারা যায়।

মন্ত্রগ্রহণের তাৎপর্য্য।

বৎস! মন্ত্রের বিষয় তোমায় সংক্ষেপে বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর। পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "মন্ত্র-শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বিন্দু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বীজ ইহার শক্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে এই বীজকে শক্তি বা প্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের একত্রীভূত কার্য্যকে শব্দ ব্রহ্মের নাদ বলে। মন্ত্রদ্বারা কিরূপ শব্দ হয়, সে বিষয়ে অতি সামান্য মতভেদ আছে। একদল উপাসক বলেন—উহা শব্দ ব্রহ্মের প্রকাশক। অপর দল বলেন,—শক্তির প্রকাশক। আর একদল বলেন—শব্দ ব্রহ্ম সকল পদার্থেই বিদ্যমান। মানবের কুণ্ডলিনী-নদীতে এই শক্তি আছে, আর সেখান হইতেই বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের উৎপত্তি হয়।

সুপ্তা নাগোপমা হেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাক্‌দেবী বীজসংজ্ঞকা ॥

—শিবসংহিতা।

কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তসর্পের আকার ধারণপূর্ব্বক নিজপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইহাঁর সকল অবয়ব-সংস্থান সর্পের ন্যায়। ইনি বাক্‌দেবী। ইহাঁ হইতেই সকলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়; ইনি (বর্ণময়ী) সমগ্র বীজমন্ত্রস্বরূপা। আমাদের তিনটি প্রধান দেবতা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইহাঁরা একই ব্রহ্মের ভিন্ন অবস্থা-শক্তিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁর বিকাশ মহৎ, তিন ভাগে বিভক্ত, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ইহাঁ হইতেই তিন অহঙ্কারের সৃষ্টি। অহঙ্কারের মধ্যে দশ দেবতা যাহাদিগের নাম দিক্ (দশদিক্), বায়ু, অশ্বিনী, অগ্নি, সূর্য্য, প্রচেতা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র,

মিথিরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা। ইহা হইতেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ) এই পঞ্চমহাভূত হইতে মানবদেহ উৎপন্ন এবং তন্মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সংস্থাপিত। যোগশাস্ত্রে রূপক-ভাবে কথিত হইয়াছে যে, দেহমধ্যে তিনটী নদী প্রবাহিতা; উহাদিগকে ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না বলে। ইহারা নাসিকা হইতে নাভির কিঞ্চিৎ আধোদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং গুহ্যদ্বারের কিছু উপরেই কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান। কথিত আছে, তিনি সর্পের ন্যায় জড়াইয়া থাকেন এবং যখন যোগক্রিয়া দ্বারা জাগ্রত করা যায় তখন প্রসারিত হন এবং ব্রহ্মদ্বার পরিষ্কার করেন। এই কুণ্ডলিনী হইতেই শব্দের উৎপত্তি। কুণ্ডলিনী হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে পরা, পশ্যন্তি ও মধ্যম এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে নির্গত হয়। যখন নির্গত হয় তখনই আমরা তাহা শুনিতে পাই ও বলিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি। সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। দার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ-জগৎ শব্দ হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ যে কথা বা শব্দ কোন বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহার সহিত সেই বস্তুর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি এ বিষয় অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি শব্দ ও কথার মধ্যে কথাকেই প্রথম বলেন। কথা আগে, শব্দ পাছে। মনে কর, গাভী একটি কথা। গাভী বলিলে আমরা কি বুঝি? চারি পা, লেজ, ককুদ, খুর ও শিংযুক্ত একটি জীব। তাহাই কি গাভী? উহার অস্থি-সঙ্কালন, চক্ষুর দৃষ্টি, তাহাই কি গাভী? পতঞ্জলি বলেন—না; ও সকল গাভীর কার্য্য। তবে কি তাহার গায়ের শ্বেত, কৃষ্ণ অর্থাৎ তাম্রবর্ণ ইত্যাদি গাভী? পতঞ্জলি বলেন—না, তাহাও নহে। তবে কি?—কাহাকে গাভী বলিব? অথবা গাভী বলিতে কি বুঝিব? গাভী একটি কথা যে কথা মুখ দিয়া নির্গত হইলে আমরা সেই শব্দ শ্রবণ-মাত্র উপলব্ধি করি যে, এই প্রকার চতুষ্পদযুক্ত, পুচ্ছযুক্ত, খুরযুক্ত,

শৃঙ্গযুক্ত একটি জীব। গাভী সেই শব্দ ভিন্ন আর কিছু নহে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তদাত্ম কোন কথা ও সেই কথার নির্দ্দেশক বস্তুমধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কুণ্ডলিনীতে পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। ইহার অর্থ অনেক প্রকার। মন্ত্রশাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে যে, এই পঞ্চাশটি অক্ষরই কুণ্ডলিনীর পরা-অবস্থা হইতে উৎপন্ন, এবং ইহা হইতে যে শক্তির উৎপত্তি হয় তাহাই শব্দরূপে প্রকাশিত। বৈয়াকরণিকগণ বলেন, ইহা হইতে সংস্কৃত ভাষার পঞ্চাশটি অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

যখন কোন শব্দ করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করা হয়, তখন হৃদয়ে বা অন্তঃকরণে প্রথম প্রণব বা ওঁকার শব্দ হয়। যখন কোন একাক্ষর-শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখনও এই প্রণব উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন স্বরযন্ত্রে আঘাত করিলে এই প্রণব ধ্বনিত হয়। যতকাল দেহে প্রাণ থাকিবে, ততকাল দেহমধ্যে এই শব্দ ধ্বনিত হইবে; ইহা দেহমধ্যে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা শুনিবার জন্য উপযুক্ত হইলে, সর্ব্বদাই এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আমরা অন্যান্য শব্দে অত্যন্ত আকৃষ্ট, তাই এ শব্দ শুনিতে পাই না। নতুবা দেহমধ্যে অহর্নিশি এ শব্দ উত্থিত হইতেছে। এই তত্ত্ব হইতে জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন যে, সর্ব্বত্রই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই এই প্রণব-ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়।

আর্য্য ঋষিগণ এইজন্যই প্রণবকে প্রথম শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রণব—প্রথম শব্দ বা প্রথম মন্ত্র। ইহার আর একটি অর্থ ব্রহ্ম—সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই প্রণব।

কুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া শব্দ পূর্ব্বোল্লিখিত নাড়ীত্রয়ের কোন একটির মধ্যে গমন করে। যেরূপ অক্ষর উচ্চারণ করিবার আবশ্যক হয় শব্দ আপনা হইতেই সেই নাড়ীতে গমন করে। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত

সমস্ত অক্ষর ইড়া হইতে প্রবাহিত হয়। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পিঙ্গলা দ্বারা এবং য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সুষুম্না-পথে বাহিত হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর আদি-দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। অর্থাৎ ঐ ঐ দেবতার সহিত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নদীত্রয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধ যে কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না।

মন্ত্রগুলি বীজাক্ষর হইলেও শিব, শক্তি ও বিষ্ণু এই তিন অংশ বিদ্যমান। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি গুণসমষ্টি ও কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতা একই পদার্থ অর্থাৎ দেবতা শব্দে গুণসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সাকার উপাসনার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও কৌশল।

গুরু।—বৎস! সর্ব্বপ্রকার সাকার উপাসনাই নিরাকার উপাসনার সোপানস্বরূপ; নিরাকার উপাসনাই নির্ব্বাণ-মুক্তির কারণ; নির্ব্বাণ মুক্তিই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য। এই কার্য্যটি যেমন বৃহত্তম, ইহার উপকরণও সেইরূপ কষ্টসাধ্য। অনেক জন্মে, অনেক যত্নসাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক দানধ্যানাদি সৎকর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাই ইহার উপকরণ স্বরূপ।

বৎস! মা জগদম্বার উপাসনায় যোগসাধন করিবার উপায় আছে, এবং তাঁহার উপাসনাতে মানবের যেরূপ সহজে মুক্তিলাভ হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ভক্তিপূর্ব্বক শক্তি, বিষ্ণু ও শিব, যে দেবতাকে আরাধনা কর না কেন, সেই এক ব্রহ্মের আরাধনা ভিন্ন কিছুই নহে। তবে আজকাল দেশকালপাত্র অনুসারে অনেক সম্প্রদায় ধর্ম্ম লইয়া ছেলে-খেলা করে মাত্র; কারণ শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অন্তঃকরণে কেমন এক বিদ্বেষের ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ বৈষ্ণব শাক্তকে, অথবা শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে। কিন্তু সাকার উপাসনা যে ভাবেই কর, সেই অনুদ্দেশ্য অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য, বৎস মানবের প্রথমে চিত্ত শুদ্ধি ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

বৎস! তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানব কখনই একেবারে

সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না সেইজন্য মানবকে প্রথমে সাকার উপাসনা করিতে হয় এবং সেই উপাসনা দ্বারা মানব আপনা আপনি অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমায় জানাইতেছি :—"আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ভগবানকে মনুষ্যরূপে দেখিতে হইবে। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল। তাহাদের স্বভাবানুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটী মহিষ দেখিবে। মৎস্য ভগবানের আরাধনেচ্ছু হইলে তাহারা ভগবানকে একটী বৃহৎ মৎস্য ভাবিবে। মানুষ ও ভগবানকে মানুষই ভাবিবে। কদাপি মনে করিও না যে, ঐ সকল বিভিন্ন ধারণা বিকৃতকল্পনাসম্ভূত মাত্র। মানুষ, মহিষ, মৎস্য, এগুলি যেন বিভিন্ন পাত্রস্বরূপ—সকল গুলিই ভগবৎ-সমুদ্রে নিজেদের জলধারণশক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইতে গেল। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল; মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। অথচ প্রত্যেক পাত্রেই সেই একই ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। মানুষ তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবে; আর তির্য্যগ্‌জাতির যদি ভগবৎসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান থাকে, তবে তাহারা নিজেদের ধারণারূপ পশুরূপে তাঁহাকে ভাবিবে। অতএব আমরা ভগবানকে মানুষরূপে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং আমাদের তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে,—**অন্য কোন পথ নাই।**

দুই প্রকার লোক ভগবান্‌কে মানুষরূপে উপাসনা করে না; (১ম) নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্ম্মজ্ঞান নাই; (২য়) পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করিয়া মানব-প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন।"

বৎস! যোগসাধনা না করিলে আত্মদর্শন হয় না; কিন্তু কলিকালে মানব অল্পায়ুঃ ক্ষীণবুদ্ধি বলিয়া যোগসাধন করিতে সক্ষম হয় না। সেই জন্য আর্য্যঋষিগণ প্রতিমার আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং রূপকভাবে যোগ-সাধনের সমস্ত উপায় বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মায়ের আরাধনা করিলে মানব যেরূপ সহজে অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সেরূপ সহজ উপায় পরিলক্ষিত হয় না।

প্রতিমাপূজার কি কি কৌশল নিহিত আছে, এক্ষণে তাহা জানাইতেছি।

"প্রথম।—যাবৎ মানুষের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না। অথচ জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী। চেতনাচেতন যাবতীয় পাদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূলজ্ঞানী ব্যক্তি যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্ত্তিতে ঈশ্বর-বোধ সংস্থাপন করে, আর তিনি মনুষ্যবৎ সুখদুঃখাদি অনুভব করেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ-মমতাদি প্রকাশিত করিতে অভ্যাস করে, তবে তাহার অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল ও নিশ্চল হইবে, এবং তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই যুক্তিতে ঈশ্বরমূর্ত্তির "আত্মবৎ সেবা" নামক প্রথম কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

"পুরাণাদি শাস্ত্রের পৌত্তলিক-আরাধনা-ঘটিত যাবতীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতেই সমুদ্ভূত।

"দ্বিতীয়।—যখন এরূপ জ্ঞান জন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিলেও কোন জড়মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরাংশ বাস্তবিক সুখ দুঃখ অনুভব করেন না, ও মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই, তখন তাঁহাকে সুখদুঃখাতীত পবিত্র-

স্বরূপজ্ঞানে, কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। তখন সম্মুখস্থ বিশেষ ভাবময়ী কোন মূর্ত্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তি-প্রকাশের চিহ্ন, এরূপ আর কিছুই নহে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া "চিত্রিত বা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে সচেতনত্ব কল্পনা পূর্ব্বক ঈশ্বর পূজা"-রূপ দ্বিতীয় কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে। পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনাদিঘটিত যাবতীয় ব্যবস্থা এই কৌশলই হইতে সমুৎপন্ন।

"তৃতীয়।—ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা যখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব-বোধ দৃঢ় হইয়া আসে, তখন নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ব্যতিরেকে ও যে কোন বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বরপূজার সফলতা অনুভব হয়। তজ্জন্য "বাহ্যপূজা"-রূপ তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

"তাম্রকুণ্ড ইত্যাদি জলপাত্রে, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয়ে এবং তুলসী-বৃক্ষাদি বা ঘটাদিতে অব্যক্ত চৈতন্যের পূজা এই কৌশল হইতে উৎপন্ন।

"চতুর্থ।—ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যখন এরূপ বোধ হয় যে, জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশস্বরূপ, তখন আপন দেহমধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হয়। তদবস্থার নিমিত্ত "মানসপূজা" নামক চতুর্থ কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

"প্রাত্যহিক পূজাকালে আন্তরিক আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মানসিক পূজা ইত্যাদি এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।"

বৎস! সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সংসারে থাকিয়া মায়ের উপর অচলা ভক্তি দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাস প্রভু রামচন্দ্রের উপর অচলা ভক্তি দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি যাঁহাকেই আরাধনা কর, সেই এক ব্রহ্মেরই আরাধনা করা হইবে জানিও; সুতরাং নিরোধরূপী ভক্তি দ্বারা মায়ের আরাধনা কর, দেখ মুক্ত হইতে পার কি না। ভগবান্ পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে,—

জলের ভিতর ডুব্‌লে যেমন হাঁকু পাঁকু প্রাণ,
তেম্‌নি ধারা হলে পরে মিল্‌বে ভগবান্‌।

অতএব মায়ের উপর অচলা ভক্তি কর এবং ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত তাঁর উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য কর।

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে, এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবান-বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে, এবম্ভূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয়।" পূর্ব্বে আচার্য্যদের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে দেখা যাইত, কারণ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন সুতরাং তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে বীতরাগ ও সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই জন্য সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনে যাইয়া পরমার্থ চিন্তা করিতেন। কিন্তু আজকাল সেই মহামহিমান্বিত ব্রাহ্মণগণ নিজের গুণ অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমোগুণপ্রধান হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের সামান্য জ্ঞানে সংসার পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই নষ্ট হইয়া যাইবে। **অতএব পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ী মায়ের প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার উপর অচলা ভক্তি দ্বারা উপসনা কর, তাহা হইলেই মুক্ত হইবে।**

শিষ্য।—মায়ের আরাধনায় কি অধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা আমার বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু।—বৎস! এক মহাত্মা মায়ের অধ্যাত্ম বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর:—"এই উভয়-কালীন দুর্গাপূজা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত পরমাত্মার উপাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। যাহারা দুর্গামহোৎসবে তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য করে, কিম্বা আমরা তত্ত্বজ্ঞানী,—ইহা [illegible] কর্ম্ম

—এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া অথবা আলস্য বা মোহবশতঃ পরিপূর্ণজ্ঞানময়ী দেবীর পূজার্চ্চনা না করে, ভগবতী ৺দুর্গাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদের সমস্ত অভিলাষ হইতে বঞ্চিত করেন; তাহাদিগের আর কোন সাধনাই সফল হয় না। এইরূপ শাসনবাক্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। জৈগীষব্য প্রভৃতি পূর্ব্বে যত যত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সগুণ-ব্রহ্মে চিত্তস্থাপন করিয়া নিগুর্ণতালাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ মুক্তিসাধন বিষয়ে এই পথ ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। মহাবিস্তৃত নিগূঢ়-তত্ত্বময় দুর্গোৎসব ব্যাপারের প্রত্যেক কার্য্যের একদিকে পৌরাণিক কল্পনা, অন্যদিকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ,—এই উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন—দুই পথ। পৌরাণিক কল্পনাতে দক্ষিণায়ন পিতৃযানে ও উত্তরায়ণ দেবযানে বলিয়া গণ্য। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে এবং চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিমার্গের যে কর্ম্ম তাহা দক্ষিণায়নে, এবং নিবৃত্তিমার্গের যে কর্ম্ম তাহা উত্তরায়নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। একারণ শাস্ত্র বলেন যে, দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ন ও রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই নিদ্রিত দেবগণকে জাগাইতে হইবে। তাহার নাম "বোধন"। উত্তরায়নে জাগ্রদবস্থা; তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্যপ্রযুক্ত বোধনের প্রয়োজন হয় না। এতাবতা প্রকৃতিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভ প্রত্যাশা করিলেই ঐ প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ করিয়া লয়েন। বোধন শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ; যথা—

প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারো নিবৃত্তিস্ত তদন্যথা।

—ইতি যামলং।

সংসারকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে; তদ্ভিন্ন নিবৃত্তিমার্গ; অর্থাৎ সংসার-সন্ন্যাস ধর্ম্মকে নিবৃত্তিমার্গ কহে।

অপরন্তু কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রিতাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ ও তাঁহার জাগরণাবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অতএব কুণ্ডলিনী বোধনের নামই বোধন বলিয়া যোগিগণ নিয়ত কুলকুণ্ডলীনিকে বোধনে রাখিয়াছেন। এনিমিত্ত তাঁহাদের নিয়ত দেবযান উত্তরায়নে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ তৎকার্য্য আদিত্যদ্বারে গমন করিতেছে।

আদিত্য শব্দে সূর্য্য। অধ্যাত্মতত্ত্বে সূর্য্যশব্দে পিঙ্গলা নাড়ি; তাহা দক্ষিণ নাসিকাতে অবস্থিত। তাহাতে প্রাণবায়ু বহনকালে কুণ্ডলিনী জাগ্রতাবস্থায় থাকেন; সুতরাং তত্ত্ব-চিন্তকেরা কুণ্ডলিনীর জাগ্রতকালকে দিবা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

এই জন্যই কাল-চিন্তকেরা দেবযান উত্তরায়নকে দেবতাদিগের দিবা বলেন। দেবতা শব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গণ। এই ইন্দ্রিয়গণকে কুণ্ডলিনী জাগ্রত অবস্থায় বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত নিদ্রিতাবস্থার বিষয়ে অভিভূত করেন; তৎকালে কোন যাগযজ্ঞাদি সাধন বা সম্পন্ন হয় না।

শ্রীবৃক্ষ বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥

হে পরমাত্মন্! আমি যাবৎ পূজাদি করিব, তাবৎ তোমাকে শ্রীফল-বৃক্ষে বোধন করাইব—এইরূপ উক্ত হয়। অর্থাৎ তুমি সত্যাত্মারূপে জগদ্ব্যাপী; সেই জগদ্রূপে তোমাকে বোধন করাইব। যখন চিত্ত সমাহিত হইবে, বাহ্য পূজা থাকিবে না, তখন তন্ময় হইয়া যাইবে।

জগৎশব্দে ব্রহ্মাণ্ড; ব্রহ্মাণ্ড পদে বিরাট।

অর্থাৎ জগদীশ্বর বা ঐশ্বরী শক্তি বিরাটরূপে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছেন। তদীয় স্বরূপবোধের নামই শ্রীবৃক্ষে বোধন্। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাই সকলকে প্রতিশোধিত করাব নাম বোধন বলা হইয়াছে। শ্রীবৃক্ষ শব্দেও ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ শ্রীসম্বন্ধে

ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল; সুতরাং শ্রীবৃক্ষ বলাতে ব্রহ্মাণ্ড শব্দই প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্বরূপতঃ রূপকব্যাজে শ্রীফল শব্দে ব্রহ্মাণ্ড; তাহাতে প্রসুপ্ত চৈতন্য-শক্তির উদ্বোধনের নাম শ্রীবৃক্ষদেবীর বোধন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ স্বন্তি তে বসন্তি কলেবর॥

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, কলেবরেও তাহাই আছে। অর্থাৎ শ্রীই শরীরের ফলস্বরূপ; একারণ এখানে দেহকে শ্রীফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপা জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীবশরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্য-শক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তন্নিদ্রাভঙ্গ পদে চৈতন্যরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে বোধ করাইবার কথা বুঝিতে হইবে। সেই জ্ঞান-শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গার্থে অনেক জপ, তপ, পূজা ও যোগাদি করিতে হয়; তাঁহার বোধন না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রাণায়াম ও জপ-যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না; সুতরাং দুর্গোপলক্ষে আধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষণপক্ষে ভোগপর তমোঃময় অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত অপরপক্ষের নবমকল্পে শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বাহ্য-পূজোপদেশ দেবীর বোধন এখানে স্বরূপার্থ সঙ্গত হয় না; যেহেতু প্রথমতঃ দেবীর নিদ্রাই অপ্রশস্ত; দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষোপরি শয়ন অত্যন্ত অলীক; সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ববোধই এই বোধনের স্বরূপার্থ মানিতে হইবে।

নবম্যাদী কল্পে দেবীর বোধনাভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল; অতঃপর ষষ্ঠ্যাদিকল্পে দেবীর সায়ংকালের বোধনের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইতেছে।

ষষ্ঠী—এই সংখ্যাবাচক শব্দটী উপাসনা-ভেদের সময়বিশেষ, এবং কালাবয়ব অর্থাৎ তিথি ও যোগাবয়ব এই তিনেরই বিশেষণ; যথা আসন প্রত্যাহার প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধি এই ষড়ই যোগ।

এস্থলে প্রতিপদ আসনযোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থী ধ্যানযোগ, পঞ্চমী ধারণাযোগ, ষষ্ঠী সমাধিযোগ, ইহা প্রতিপদাদি তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যদানস্থলে বোধিত হইয়াছে।

প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে; ইহাতেই আসন-যোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ-সংযমার্থে ডোরক-দান-স্থলে ইন্দ্রিয়-সংযমন প্রত্যাহার যোগ উক্ত করিয়াছেন। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত তিলকদান-স্থলে প্রাণায়াম যোগ উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ঈড়া ও স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী পিঙ্গলা নাসাভ্যন্তরচারিণী, পুরক-রেচকাদি-লক্ষণ-সমন্বিতা; সুতরাং ইহাতে প্রাণায়াম যোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে।

চতুর্থীতে উচ্চাবচ ফলদানাচ্ছলে জগতের অভিলষিত ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরদরূপ ধ্যানযোগের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে ককতিকা-দানস্থলে ধারণা-যোগ কথিত হয়; কারণ অসার বর্জ্জন পুরঃসর সারবস্তুর সন্ধানই ধারণা-যোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য ও মধুপর্ক-প্রদানচ্ছলে সমাধি-যোগোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; কারণ মধুধারাপানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী এক এক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্তস্বরূপে কালাবয়ব প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক দ্রব্যদানাচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্প-পূজোপলক্ষে ষষ্ঠী অবসানে অর্থাৎ সায়ংকালে বোধন করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানপ্রাপ্তির নাম বোধন; সুতরাং সমাধির পর বিজ্ঞানকোষপ্রাপ্ত সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়; তদ্বোধন ব্যতীত বিশ্রান্তি সুখ লাভ হয় না। অনন্তর

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে আনন্দময়কোষপ্রাপ্ত জীব জীবনমুক্তের ন্যায় নিত্যমহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে।

একারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয়। ইহাকেই শারদোৎসব বলে। এই তত্ত্ববোধনোপদেশ নবমী-কল্পে শ্রীবৃক্ষে দেবী-বোধনেই বোধ করিতে হইবে।

আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ॥

আর্দ্রাযুক্ত অপরপক্ষীয় কৃষ্ণানবমীতে শ্রীবৃক্ষে বোধন, মূলাযুক্ত সপ্তমীতে প্রবেশন, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী ও উত্তরাষাঢ়াযুক্ত নবমীতে অর্চ্চন, এবং শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যোগার্দ্রচিত্তবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের নাম বোধন; ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মূলে প্রবেশের স্বরূপার্থ এই যে, মূলানক্ষত্র উপলক্ষ মাত্র, শুদ্ধ প্রাণায়াম যোগসিদ্ধির কারণভূতা কুলকুণ্ডলিনী জগদ্-যোনি জ্ঞানশক্তির প্রকাশভূতা শুদ্ধাত্মিকা শক্তির সহিত জীবের মূলাধারে সুষম্নাবর্ত্মে প্রবেশের নাম মূলাতে প্রবেশন। পূর্ব্বোত্তরে পূজনার্থে অষ্টমী কলাতে প্রবৃত্ত সাধক পূজা-জপাদি-সহকারে সগর্ভ প্রাণায়াম করিবে; উত্তরে নবমী কলাতে প্রণবাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণধারণা করিবে; তদর্থে পূজা-জপাদির আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ যে সাধক অন্নময়াদি কোষের গত হয়েন তাঁহাকেই যোগশাস্ত্র প্রাপ্তসমাধি বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন।

স্বঘটে জ্ঞানশক্তির প্রবেশ মূলাধারে হয়; একারণ অষ্টমীতে বাহ্যে মৃণ্ময়াদি ঘটস্থাপনা করিয়া আবাহনাদি করে; তাহার প্রমাণ—মানস-পূজার শিরঃসহস্রারস্থ ইষ্টদেবতারূপে পরমাত্মাকে স্বহৃদয়-ঘটে অধিষ্ঠিত করিয়া মানসোপচার প্রদানে পূজা করিবার পদ্ধতি চিরপ্রথিত।

সেই পূজাই বাহ্যে কল্পিত ঘটে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং ফলে পরতত্ত্ব ঘটিয়া উঠিয়াছে।

অষ্টমীতে ঘট ও ভদ্রমণ্ডলাদি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বাহুল্যরূপে পূজা করিয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরস্থিত সমস্ত তত্ত্বকে লক্ষ করিবার উপায়ার্থ আবরণ দেবদেবীরূপে গন্ধপুষ্পদানাচ্ছলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; যে হেতু পীঠপূজা ও আবরণ-পূজা-মন্ত্রার্থেই প্রকাশ আছে যে এসকল বাহ্য বিষয় মাত্র নহে। তথাপি প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধির সহিত বাহ্য সম্বন্ধের ঘটনা হয় না; উহার ফল কেবল অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃকান্যাসও শরীরাভ্যন্তর-বৃত্তির আবৃত্তি মাত্র। যথা আধারে লিঙ্গ, নভো ইত্যাদি মন্ত্রে শরীর যে কালাত্মক, সেই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। "পঞ্চাশ গ্লিপিভি" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থে বাহ্যাবয়ব উপলক্ষে বর্ণমাত্র লক্ষ্য করিয়াছে, অর্থাৎ পূজকেরা যে সকল বর্ণাত্মক মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা সাধকের শরীর হইতে স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং মন্ত্রসকল যে আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে, উহা ঐ পূজাচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ পীঠপূজা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিপোষক। হৃদ্গহ্বর পরমাত্মার পীঠ। বাহ্যিক যত আধার, সেই সমস্ত আধারই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে। একারণ "হৃদি আধার শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান করা হয়, কিন্তু বাহ্যপূজাকালে ঐ পূজা মানসে বা কল্পনাতেই সম্পন্ন হয়। তাহার একপীঠও কস্মিন্‌কালে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না।

কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদী, সিংহাসন এবং দক্ষিণ স্কন্ধে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম, বামে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণে ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই অচাক্ষুষ বিষয়। চতুর্থতঃ আবরণ-শক্তিপূজা ক্রমে খ্যাতি, সৌম্যা, রৌদ্রা, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতিশান্তি,

লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, শোভা, বৃত্তি, ভ্রান্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ব্যাপ্তি, অনসূয়া, প্রাপ্তি, চিতি ইত্যাদি সমস্তই সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মার উরুশক্তি ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং অষ্টমী-পূজাচ্ছলে বিজ্ঞানময় কোষের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চমতঃ মহানবমী উত্তর কার্য্য হইলেও তাহাতে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহাতে ঘট-যন্ত্রাদির অপেক্ষা নাই। ইহারও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত। তথাপি পূর্ব্ব কর্ম্মফলে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত সাধকের বিশেষ আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ-রসে মগ্ন হইয়া সাধক ব্যক্তি পূজা সমাধান করিবার কামনায় যত্নবান হয়। সুতরাং এককালে প্রভুতোপচার দ্বারা অর্চ্চনা মাত্র করিয়া কার্য্যে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত করে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমার ইষ্টপূজন কর্ম্ম এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। কিন্তু হোমচ্ছলে ইহা জানাইতেছেন যে, আমি ব্রহ্মাগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম আহুতি দিয়া ভস্মীভূত করিয়া এক্ষণে বাহ্য লৌকিক কর্ম্মে আর আবদ্ধ থাকিব না; যাবৎ দেহ ধারণ করিযা থাকিব, তাবৎ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মভূতপ্রায় ও আনন্দময় বিগ্রহে প্রণবোচ্চারণে নিবিষ্টচেতাঃ হইয়া যথারুচি তথা ব্যবহারে কেবল আনন্দ সূচক সঙ্গীতেই কালক্ষেপ করিব। এই উপদেশের নিমিত্ত "নব্যমাং শারদোৎসব" অর্থাৎ সেই দিন জাতি-বিজাতি-জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল তত্ত্বোজ্ঞার্থ সঙ্গীতাদি করিবে; ইহাতে লোকলজ্জানুরোধে আপন আনন্দের বিরাম করিবে না,—এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এদিকে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ লৌকিক কার্য্যে শঙ্কারহিত হয়, ইহা জানাইয়া গিয়াছেন। শারদীয় দুর্গাপূজাঙ্গীভূত বিসর্জ্জন-কল্পকে তত্ত্বজ্ঞানানুকল্পরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরমার্থ বিষয়ে আনয়ন করাই পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্যশ্চেতি"—আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার করিতে হয়। এই শ্রুতি প্রমাণের ফল

প্রদর্শনার্থে সিংহাবলোকন ন্যায়ে শ্রুত্যুক্ত চতুর্ব্বিধ সাধকের অবস্থাভেদ দ্বারা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রর দ্বারা প্রমাণ হয়) বোধনান্তর মূলাধারে চৈতন্য শক্তির প্রবেশের নাম "ব্রহ্ম শাক্ষাৎকার"; অষ্টমীতে মনন দ্বারা জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ শান্তিপুষ্টাদির অনুস্মরণ ও ভদ্রমণ্ডলে আবরণ-শক্তি পূজনের নাম আত্মার "মনন"। নবমীতে সাধক আনন্দময় হইয়া আপনাতে দেবীরূপ ভাবনাদ্বারা উৎসবান্বিতচিত্তে হর্ষোৎসাহ প্রবৃদ্ধি করিবে; ইহার নাম আত্মার "নিদিধ্যাসন"। যখন নবমীর শেষে আনন্দের প্রতি নির্ভর করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সাধকের আর বিশেষ পূজার প্রয়োজন নাই, তবে ইচ্ছামত করিলেও হানি নাই। সেই অবস্থায় নাম জীবন্মুক্তি। তাহাতে আত্মার কেবল শ্রবণ প্রয়োজন হয়; এই জন্য আত্মাই শ্রোতব্য বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন। অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষেরা সর্ব্বোপনিষদ্-প্রতিপাদ্য আত্মার শ্রবণে জীবনাতিপাত করিবেন; পূর্ব্বাঙ্গ যাবৎ কর্ম্ম সেই তাবৎ কর্ম্মই আত্মশ্রবণ দ্বারা বিসর্জ্জন করেন। তত্ত্বজ্ঞান-সাধনের পক্ষে আত্মার শ্রবণই সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। ইহা জানাইবার জন্য "শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ" বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্ববেদবেদান্তাদি প্রমাণে তত্ত্বজ্ঞান-সাধনার উপদেশ অভিপ্রায়ে দুর্গোৎসব কার্য্য সর্ব্বকালই জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

নবপত্রিকা না হইলে দুর্গোৎসব হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী হয় না,—শাস্ত্রকর্ত্তারা রূপক-ব্যাজে ইহাই জানাইয়াছেন।

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিল্ব দাড়িমৌ।
অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ অশোক মানক ও ধান্য, এই নববৃক্ষে নবপত্রিকা হয়, এই নবপত্রিকা অপরাজিতা লতার দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার বিধি ও ব্যবহার আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বরস্বতী নাড়ী তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী; ঐ নাড়ীর ছিদ্রে প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জ্ঞানোপযোগিনী মেধা জন্মে॥ সেই মেধা বিষ্ণুবৎ সর্ব্বপ্রবেশন, শক্তিমতী, একারণ তাহার নাম বিষ্ণুক্রান্তা লতা। ঐ বিষ্ণুক্রান্তা লতার নামান্তর অপরাজিতা লতা॥ সুতরাং অপরাজিতা বেষ্টনের তাৎপর্য্য এই যে, মেধাকে পরাজয় করিতে পারে না।

সত্বরজস্তমোগুণাকারে ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানরূপকে ত্রিবিধ বেষ্টন করিয়া রাখিলে সাধক ব্যক্তি অস্খলিতরূপে তত্ত্বজ্ঞানসোপানে স্থির থাকিতে পারে। ইহা জানাইবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বারম্ভক রম্ভাতরুকে অপরাজিতা দ্বারা বেষ্টন করিতে কহিয়াছেন।

শিষ্য।—আপনার মুখে ধর্ম্মসম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় পরম-আনন্দ-রসে অভিষিঞ্চিত হইল; এবং সংসারী ব্যক্তিদের সাকার উপাসনাই যে নিরাকার উপাসনার সোপানস্বরূপ, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। তবে আমার মনের মধ্যে আরো একটু সন্দেহ আছে। আমি শুনিয়াছি যে, তন্ত্রে পঞ্চমকার-সাধন করিবার উপদেশ আছে; তবে কেন আপনি পূর্ব্বে মদ্য পান একেবারে নিষেধ করিয়াছেন এবং কেনই বা তবে মৎস্য বা মাংস সাত্ত্বিক আহার হইতে পারে না বা ব্রাহ্মণেরা তাহা আহার করেন না। দ্বিতীয়ত সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে আত্মবৎজ্ঞান, এই কয়টী আত্মজ্ঞানের চিহ্ন; তবে তন্ত্রে কেন জীবহিংসা করিয়া মৎস্য বা মাংস খাইতে আদেশ দিতেছেন, তাহা আমায় বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস! তন্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ে অতি রূপকভাবে উপদেশ দেওয়া আছে; তাহা তত্ত্বজ্ঞানী না হইলে বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন।

মনকে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিই ঐ তন্ত্রের মধ্যে যে নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সম্পূর্ণভবে বুঝিতে পারেন। যাহা হউক বৎস! পঞ্চমকার-সাধন করিবার যাহা উপদেশ আছে, তাহাতে মদ্য পান বা মৎস্য মাংস আহার করিবার উপদেশ নাই; উহা কেবল যোগসাধনের উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমায় বিস্তারিত রূপে জানাইতেছি।

(১) মদ্য।

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধক॥

হে বরাননে, ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত যে অমৃতধারা, তাহা পান করিয়া যে আনন্দময় হয়, তাহাকেই মদ্যসাধক বলে॥

(২) মাংস।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসন প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধক॥

হে দেবী রসনাপ্রিয়ে (পার্ব্বতী), রসনার নাম মা; তদংশ বাক্য; যে ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাক্যসংষমকারী, মৌনাবলম্বী যোগী, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায়।

(৩) মৎস্য।

গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুই মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, সেই মৎস্যকে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক। স্পষ্টার্থ এই যে, এস্থলে গঙ্গা শব্দে ঈড়া নাড়ী, আর যমুনা শব্দ পিঙ্গলা

নাড়ী। এই ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ত গতায়াত করিতেছে, তাহারাই মৎস্যদ্বয়। এই মৎস্যদ্বয়ের ভক্ষক যোগী যিনি প্রাণায়ামসাধক শ্বাস প্রশ্বাসকে—নিরোধ করিয়া কুম্ভকের দ্বারা পুষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকেই মৎস্যসাধক বলে।” অতএব বৎস! পঞ্চমকার—রূপকভাবে যোগশিক্ষা ভিন্ন কিছুই নহে; কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তন্ত্রের ২।১ পাতা উল্টাইয়া জনসমাজে মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিতে বলে, অথবা অপরের মুখে শুনিয়া নিজেরাও ঐ সমস্ত অব্যবহার্য্য জিনিষ ব্যবহার করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট করে। মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সেই ব্যক্তির মন কথনই ধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে না বলিয়া উক্ত জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য।

(৪) মুদ্রা।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং।
সূর্য্যকোটী প্রতীকাশং চন্দ্রকোটী সুশীতলং,
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্চতে॥

হে দেবেশি! শিরসিস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ আত্মার অবস্থিতি। কোটিসূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হয়েন। তিনি অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তিসংযুক্ত। যাঁহারা সেই পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাঁহারই নাম মুদ্রাসাধক।

(৫) মৈথুন।

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং॥

রেফস্তু কুঙ্কুমাভাস কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারশ্চ বিন্দুরূপে মহাযোনৌ স্থিত প্রিয়ে॥
আকারো হংসমারুহ্য একতাচ যদা ভবেৎ।
তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বকর্ম্মানি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্ম ময়ং ভবেৎ॥
ইদন্তু মৈথুনং তত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্বং তত্বজ্ঞানস্য কারণং॥
সর্ব্বপূজাময়ং তত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়াঙ্গ পূজয়েদ্দেবী সর্ব্বমন্ত্র প্রসীদতি॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ মৈথুন পরমতত্ব। মৈথুনে সিদ্ধ ব্যক্তির সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আনন্দ উদয় হয়। রেফ কুঙ্কুমবর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহাযোগীতে স্থিত। হে প্রিয়ে! আকাররূপ হংসকে আরোহণ যখন উভয়ের ("র" ও "ম" এই অক্ষরদ্বয়ের) একতা হয়, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। ঐ পদার্থ (অর্থাৎ রাম এই শব্দের বিষয়ীভূত পরমাত্মা) আত্মাতে রমণ করেন, এইজন্য তাঁহাকে আত্মারাম বলে। অতএব রাম এই শব্দ নিশ্চয়ই তারকব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে রাম এই অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ শব্দ স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক (পাপ ও পুণ্যাদি) সকল কার্য্যের ফলভোগ রহিত হইয়া ব্রহ্মময় হয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই মৈথুন-তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। মৈথুন পরমতত্ব; ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ

সর্ব্বপূজাময় ও জপাদির ফল প্রদানে দেবী ষড়ঙ্গ দ্বারা পূজা করিলে সকল মন্ত্রই প্রসন্ন হয়। —হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।

শিষ্য।—৺কালীমাতার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কি, তাহা বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস, তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"কালীর ধ্যান বা মুর্ত্তিপূজায় বেদান্তবিজ্ঞান।

(ত্রিশূল হইতে গৃহীত।)

ব্রাহ্মণ।—ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। এক্ষণে সত্বোন্মুখী হওয়ায় 'ঘোররাবাং' অর্থাৎ অজপা 'হংসঃ হংসঃ' এই শব্দে প্রকৃতি চলিতেছে; ইহা ঘোর অর্থাৎ এই হংস হংস শব্দ কোনস্থান হইতে কি প্রকারে হইতেছে, ইহা রজস্তমোগুণে বোধ হয় না বলিয়া অর্থাৎ ইহা দুর্লভ বলিয়া ইহাকে ঘোর বলিলেন। অথবা সত্বগুণাধিক্য মানব এই মায়ার গোলযোগ ঘোর দেখেন; আর এই প্রকার নাশ বা পরিবর্ত্তন তমোগুণ এবং স্থিতি পালনের প্রকার প্রকৃতির রজোগুণের কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতিকে "মহারৌদ্রীং" বলিয়া এই প্রকৃতির পরিণাম শ্মশানহেতু "শ্মশানালয়বাসিনীং" বলিলেন। অথবা শ্মশানলয়-বাসিনী কি না—মহাপ্রলয়ে জগতের উপাদানভূত পঞ্চমহাভূত শবরূপ পরমব্রহ্মে শয়ন করে বলিয়া পরমব্রহ্মকে শ্মশান বলে, তাহাতেই —সেই পরমব্রহ্মে আলয় বলিয়া প্রকৃতিকে "শ্মশানালয়বাসিনীং" বলিলেন।

তাহার পর ধ্যান কি বল।

ব্রাহ্মণ।—বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং।

স্বামী।—এইরূপে মানব যখন প্রকৃতির জন্মমৃত্যু পালনাদি কার্য্য বুঝিলেন, তখন তাহা প্রত্যক্ষের নিমিত্ত প্রকৃতিতে সত্বগুণের কার্য্য

দেখাইবার জন্য মর্ত্তলোকে বালসূর্য্যের ন্যায় সুন্দর সূর্য্য, অগ্নি ও জ্ঞান-রূপ তিনটী চক্ষু প্রকৃতির দেখাইলেন।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

—৬।১৪ গীতা।

নির্ম্মলত্বহেতু সত্ত্বগুণস্থিত জ্ঞানই সেই অনাময়পদের প্রকাশক, তাই শ্রুতি বলেন—

"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

জ্ঞানশুদ্ধির দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া তাহার পর জ্ঞানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥

—১৬৫ গীতা।

জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের বৈষম্যবোধক অজ্ঞান নাশিত হয়। সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানও তাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে প্রকাশিত করেন।

জ্ঞানই ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন বলিয়া জ্ঞানকে প্রকৃতির প্রধান চক্ষু করিলেন। আর এই জ্ঞানচক্ষু আমরা সূর্য্য ও অগ্নিরূপ দুইটী চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হই, এই হেতু সূর্য্য ও অগ্নি লইয়া আমাদের উপাসনা; "ভর্গো দেবস্যধীমহি"—জগৎ-প্রকাশক সূর্য্যের প্রকাশককে আমরা ধ্যান করি। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" হে জগৎপোষক সূর্য্য! তোমার জ্যোতির্ম্ময়

পাত্র দ্বারা (কিরণ দ্বারা) সত্যের (ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর দৃষ্টির জন্য তাহা তুমি আবরণশূন্য কর। ইত্যাদি। সূর্য্য হইতে সেই স্বপ্রকাশক ব্রহ্মের প্রকাশ মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া সূর্য্য একটী প্রকৃতির চক্ষু এবং অগ্নি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদময় হয়; যেহেতু অগ্নিদ্বারাই সমস্ত স্মার্ত্ত ও বৈদিককার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতির এই কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, অবশেষে ব্রহ্মলাভ হয় বলিয়াই অগ্নিকে একচক্ষু করিয়া ব্রহ্মপ্রকাশক প্রকৃতির "তিন চক্ষু" দেখাইলেন। "তস্মাদ্বা এতে দেবা......প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি" শ্রুতিঃ। যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র, এই সকল দেবতারা এই প্রকৃতি দ্বারা প্রথম ব্রহ্ম জানিতে পারেন, "তস্মাদ্বা ইন্দ্রঃ...... প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি" শ্রুতিঃ। যেহেতু ইন্দ্র তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রকৃতি হইতে জ্ঞান লাভ হয়।

তাহার পর ধ্যান বল!

ব্রাহ্মণ।—দন্তুরাং দক্ষিণাং ব্যাপিলম্বমানকচোচ্চয়াম্।

স্বামী।—সাধক রজোগুণের আধিক্যে কর্ম্মের গতি দেখিয়া যে কর্ম্মের মুখে "ঘোরদংষ্ট্রাং" দেখিয়াছিলেন. এক্ষণে সত্ত্বগুণের আধিক্যে সেই দন্তকে "দন্তুরাং" কি না সুলক্ষণাযুক্ত দেখিলেন, কারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ম্মরূপ কচসমুহ লম্বমান কি না? অনাদিকাল হইতে "দক্ষিণাং" ব্যাপী কি না? জ্ঞান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ **কর্ম্মই** জ্ঞানলাভের উপায়।—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঁ সমঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

—শ্রুতিঃ।

কর্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক। হে মনুষ্য! এরূপ জীবন ইচ্ছা থাকিলে তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত অর্থাৎ শুভকর্ম্ম ব্যতীত এমন অন্য কোন পথ নাই, যাহাতে তোমাকে অশুভ কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

—৪।৩ গীতা।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

—৫১।২ গীতা।

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধনরূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

—২।৫ গীতা।

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে কর্ম্মই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

যজ্ঞোদানঃ তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। ৫।

—১৮ গীতা

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে।

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।

নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ উচিত নহে। ইত্যাদি।

কর্ম্ম জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া "দন্তুরাং দক্ষিণাঃ ব্যাপিলম্বমানকচোচ্চয়াম্" বলিলেন।

তাহার পর ধ্যান বল।

ব্রাহ্মণ।—শবরূপ মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাং

স্বামী।—এই শব।

মহাভূতান্যহাঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥—৫।১৩ গীতা।

ইচ্ছাদ্বেষং সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥—৬।১৩ গীতা।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত; ইহাদের কারণস্বরূপ অহংকার বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত কি না মূলা প্রকৃতি। দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চতন্মাত্র সাংখ্যগণ প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারের সহিত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, ইহাই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি সংক্ষেপে কহিলাম। ইহার মধ্যে—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

—৪।৭ গীতা।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটরূপে বিভক্ত আমার প্রকৃতি, ইহা অপরা।

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

—৫।৭ গীতা।

ইহা কিন্তু অপরা বা জড় বলিয়া নিকৃষ্টা। হে মহাবাহো! ইহা অপেক্ষা অন্য একটী জীবস্বরূপ আমার উৎকৃষ্ট-প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। এই পরা প্রকৃতিকেই শবরূপ মহাদেব বলিয়া দেখান হইতেছে। এই শবরূপ মহাদেবের উপরেই জগৎ স্থিতি করিতেছে;—

এতদ্‌যোণীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

—৬।৭ গীতা।

সমস্ত ভূতগণ এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির নিধান এবং আমিই উহার সংহারকর্ত্তা। শ্রুতি বলেন, "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—তিনি এই সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন। শ্রুতি আরও বলেন,—"সঐক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি।" অর্থাৎ আমার অধ্যক্ষতা ব্যতিরেকে এই শরীর কি প্রকারে অবস্থান করিবে? পুরুষ ইহাই চিন্তা করিলেন।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্ব ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

– ৮।১০ গীতা।

আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমাদ্বারাই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা

জানিয়া পরমার্থতত্ত্বপরায়ণ বিবেকিগণ আমাকেই উপাসনা করেন; এই বিরাট উপাসনাই ব্রহ্মোপসনা। ইহা ব্যতীত—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

—৫।১২ গীতা।

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা দেহাভিমানিদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর; অর্থাৎ দেহাভিমান নষ্ট না হইলে ব্রহ্মপদ লাভ হয় না। দেহাভিমান দূর করিবার জন্যই উপাসনা; দেহাভিমান দূর হইলে আর উপাসনা নাই; কারণ অজ্ঞানজন্যই দেহাভিমান। সেই দেহাভিমান বা অজ্ঞান নষ্ট হইলে—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

—১৬।৫ গীতা।

জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয়, সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানই তাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে। তখন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ"—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মতেই অবস্থিত করেন; তাহার পর ক্রমশোজ্ঞানের পরিপাকে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া যান। অতএব যতক্ষণ প্রকৃতি, ততক্ষণ জ্ঞান ও ততক্ষণই উপাসনা। প্রকৃতি না থাকিলে উপাসনাও নাই, জ্ঞানও নাই। বেদান্তশাস্ত্র এইরূপ প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার দ্বারা মানবকে তত্ত্বাতীত করেন বলিয়া বেদান্ত নাম ধারণ করিয়াছেন; ইহা ভিন্ন বেদান্ত আর কিছুই নহে। বেদান্তের ভিতর জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ।—যে চৈতন্যশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে শব বলা হইল কেন?

স্বামী।—শবের যে প্রকার কোন কার্য্য নাই, এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যিনি, তাঁহারও সেইরূপ কোন কার্য্য নাই বলিয়াই তাঁহাকে শব বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ।—প্রকৃতি স্বয়ং যখন জড়, যখন চৈতন্যস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ না থাকিলে ক্ষেত্র হইতে পারে না বা কার্য্য করিতে পারে না, তখন চৈতন্যের কার্য্য নাই—ইহা কি করিয়া বলিব?

স্বামী।—সূর্য্য যেমন কিছুই করেন না, অথচ সূর্য্য না থাকিলে জগতের কার্য্য বা কারণ যেমন নাই, সূর্য্য থাকাতেই যেরূপ জগতের কার্য্যকারণ চলিতেছে, সেইরূপ চৈতন্য থাকাতেই প্রকৃতি চলিতেছে; চৈতন্য না থাকিলে প্রকৃতির কোন কার্য্য-কারণ নাই; কিন্তু চৈতন্য নিষ্ক্রিয়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

—১০।৯ গীতা।

আমার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি, চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে। হে কৌন্তেয়! এই জন্যই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তস্তেষু কর্ম্মসু।

আমি প্রকৃতির কর্ম্মে অনাসক্ত বা উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহন্তেষ্ববস্থিতঃ॥

—৪।৯ গীতা।

আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি;

ভূতগণ আমাতে অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ইহাতে আমার সর্ব্বব্যাপকত্বে ও সর্ব্ব-আশ্রয়ত্বে বিরোধ নাই।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

—৫।৯ গীতা।

ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।

সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

তাহার পর ধ্যান কি বল।

ব্রাহ্মণ।—শিবাভির্ঘোরারাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং।

স্বামী।—প্রকৃতির সত্ত্বগুণাধিক্যে শবরূপ মহাদেব দর্শনের পর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, পূর্ব্বে রজোগুণে প্রকৃতিতে যে সমস্ত শব্দ ঘোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সাত্ত্বিক গুণাধিক্যে তাহা মঙ্গলময় বলিয়া প্রকৃতির চারিদিকেই বোধ হইতেছে; কারণ—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—ঈশোপনিষদ্।

যিনি আত্মাতে সমুদয় ভূত দেখেন এবং সমুদয় ভূতে আত্মাকে দেখেন, তাঁহার নিকট স্বপ্রকাশ সর্ব্বময় আত্মাও অপ্রকাশ থাকেন না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

— ঈশোপনিষদ্।

—যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদয় ভূত হয়, তখন সেই একত্বদর্শীর কি মোহ, আর কি শোক ? আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সমদর্শন হইলেই—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

—২৯ গীতা।

যোগদ্বারা সমাহিত এবং সর্ব্ববিষয়ে সমদর্শনযোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দেখেন; যাঁহাদের সমদর্শন হইয়াছে, তাঁহারা মঙ্গলময় দেখেন; তাঁহাদের আর কিছুই ভয়ানক নাই। রজস্তমোগুণে যাহা "ঘোরারাবা" বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহাই সত্ত্ব-গুণে মঙ্গলময় বলিয়া জ্ঞান হয়।

ব্রাহ্মণ।—মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।

স্বামী।—মঙ্গলময় অসঙ্গ আত্মদর্শন হইলে নশ্বর প্রকৃতি, অনাদি মহাকালের সহিত, জন্ম ও মৃত্যু—এই দুই বিপরীত ভাব লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন বোধ হওয়াকে "বিপরীতরতাতুরাং" বলিলেন। অথবা "কালঃ স্বভাবঃ" কালই হইতেছে বস্তুর স্বভাব। প্রকৃতি কালের সহিত অর্থাৎ কালানুযায়িনী প্রকৃতি বলিয়াই "বিপরীতরতাতুরাং" বলিলেন।

তাহার পর ধ্যান কি বল।

ব্রাহ্মণ।—সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।

স্বামী।—তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

—৬।১৪ গীতা।

তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানাসক্তির দ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবশূন্য; তাহা সুখাসক্তি দ্বারা

দেহীকে জ্ঞানাসক্তি করিয়া বদ্ধ করে। প্রথমে অপ্রকাশাত্মক তমোগুণে প্রকৃতিতে জন্ম ও মৃত্যু উপদ্রবরূপ যে "করালবদনাং ঘোরাং" দেখাইয়াছিলেন, পরে ক্রমশঃ রজোগুণাধিক্যে প্রকৃতির বহির্ম্মুখী কার্য্য দেখিয়া যে মুখকে "হসন্মুখীং" "বিস্ফুরিতাননাং" বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রকৃতির সত্ত্বগুণাধিক্যে প্রকৃতির অন্তর্ম্মুখী কার্য্যে আত্মদর্শন দেখাইয়া সেই মুখকে "সরোরুহাং" প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ও "স্মেরাননাং" ঈষৎ আনন্দযুক্ত; অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডলকে "সুখ-প্রসন্নবদনাং" উপদ্রবশূন্য জ্ঞানপ্রদীপ্ত মুখ বলিলেন। এইরূপে প্রকৃতি—

"বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া"। —(চণ্ডী)

প্রকৃতি বিষ্ণুমায়া হইলেও মানবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

তাহার পর ধ্যান কি বল।

ব্রাহ্মণ।—এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥

স্বামী।—এই প্রকার সত্ত্বগুণে প্রকৃতির মুখ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হইলে—

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।

—১২।২ গীতা।

আমি পূর্ব্বে যে কখন ছিলাম না এমন নহে, এবং সেই রূপ তুমিও যে ছিলেনা এমনও নহে; এই রাজগণও যে ছিলেন না এমন নহে; অতঃপর আমরা যে থাকিব না, তাহাও নহে। হিন্দুধর্ম্মের এই প্রধান তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এবংপ্রকার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী প্রকৃতিস্বরূপা কালীর চিন্তা কর; কারণ—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

—১৮।১৩ গীতা।

এই ক্ষেত্র, এই জ্ঞান, ও এইরূপ জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন। এই কালীর ধ্যানেও সেই ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যায়।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥

—২৩।১৩ গীতা।

যে ব্যক্তি এইরূপ পুরুষের স্বরূপ অবগত আছেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতির স্বরূপ অবগত আছেন, তিনি যে কোন রূপে অবস্থান করুন্ না কেন, তাঁহাকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এক্ষণে দেখ, মূর্ত্তি-পূজার ভিতর কি সমস্ত বিষয় রহিয়াছে! অতএব মূর্ত্তিপূজাই বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানলাভের প্রধান পথ। যিনি ব্রহ্মোপাসনা করেন, তিনিও মূর্ত্তিপূজা করেন; তবে মূর্ত্তিপূজা করিতে হইলে, মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন;—

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্নসিদ্ধতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপিবা॥

শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করুন্, আর যজ্ঞই করুন্ বা দেবতা-পূজাই করুন্, আত্মবোধবিনা ব্রহ্মার পরিমিত শতকল্পেও মুক্তি নাই।

ব্রাহ্মণ।—ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। অতএব

এইরূপ আত্মচিন্তা বা ধ্যান করিলেই যখন মোক্ষ হয়, তখন পূজাদি কর্ম্ম কেন? কারণ—

সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

সমুদায় কর্ম্ম যখন জ্ঞানের অন্তর্ভূ‍ক্ত।

স্বামী।—জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।

জ্ঞানের পর অচিরে শান্তি পাওয়া যায়, কেবল জ্ঞানই যে শান্তি তাহা নহে;—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

—২৪।২ কঠ।

যে লোক নিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে বিরত নহেন, সংযতেন্দ্রিয় নহেন, সমাহিতচিত্ত নহেন, যে লোক ভোগস্পৃহারহিতও নহেন, তিনি কেবল জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন না।

ধ্যানে যে প্রকার মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তির ভাবনায় যে জ্ঞান হয়, আর পূজা-পদ্ধতিতে যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, তাহাতে যে ভক্তি হয়, সেই জ্ঞান আর ভক্তি উভয়ে অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন। আমাদের মূর্ত্তিপূজা অন্তর্জগৎসৃষ্টির সহজ উপায়; কারণ মূর্ত্তিপূজায় জ্ঞান ও কর্ম্ম দুই একত্রে আছে। কেবল-জ্ঞান মরুভূমির শুষ্কতা ও কেবল-ভক্তি অন্ধকারময়; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি কোথায়ও নাই। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি—

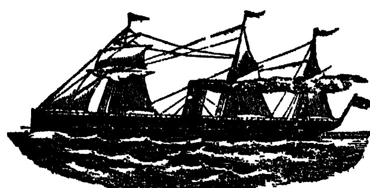
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি পঞ্চরাত্রিবিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায় প্রকল্পতে॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির বিধি বিনা যে আত্যন্তিকী ভক্তি, তাহা উৎপাত সৃষ্টি করে; যাহা বর্ত্তমান সময়ে হইতেছে। সর্ব্বপ্রধান ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে এইজন্যই "জন্মাদস্য যতঃ"

এই বেদান্তের সূত্র; কারণ জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি কেবল উৎপাতের কারণ। পুরুষ আর প্রকৃতি, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি না হইলে অন্তর্জগৎ সৃষ্ট হইবে না। যাহাকে মূর্ত্তিপূজা বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলে, তাহাতে এই জ্ঞান ও ভক্তির উভয়ের কারণ একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। আর মূর্ত্তিপূজা সঙ্কীর্ণ উপাসনা নহে; ভাবিয়া দেখিলে অধিকারিভেদে সার্ব্বভৌমিক উপাসনা। আমরা মূর্ত্তিপূজাতে সার্ব্বভৌমিক মাতৃপূজা করিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ।—বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই জন্ম-ভূমির পূজাকেই মাতৃপূজা বলে।

স্বামী।—আমরাও তাহাই করি। —"ত্রিশূল।"





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উপায় উদ্ভাবন।

(ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে উদ্ধৃত।)

মাষ্টার। ঈশ্বরে কি ক'রে মনে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান সর্ব্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ; ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়া তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জ্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্ব্বদা সদ্‌সৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু; আর সব অসৎ, কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাষ্টার। সংসারে কি রকম করে থাকৃতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌বে। স্ত্রীপুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাকৃবে ও সেবা কর্‌বে। যেন কত আপনার লোক; কিন্তু মনে জান্‌বে যে তারা তোমার কেউ নয়।

বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলেদের মত মানুষ করে। বলে—আমার রাম, আমার হরি; কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পঁড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না ক'রে যদি সংসার করতে চাও, তাহ'লে আরো জড়িয়ে পড়্‌বে। বিপদ শোক তাপ এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়্‌বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গ্‌তে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এ ভক্তি লাভ ক'রতে হইলে নির্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জ্জনে দই পাত্‌তে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জ্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়, তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এই মনে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা। সংসার জল, আর মন যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যায়,—খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জন সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ ক'রবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখ্‌লেও মিশ্‌বে না—ভেসে থাকবে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী, অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটী জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ; তাই ভক্তের কছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল "নেতি—নেতি" বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা স্বপ্নবৎ। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে; তিনি যে কি—মুখে বল্‌তে পারে না। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই—ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ-আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত-ভাবে কখন কখন সাকাররূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গ'লে যায়; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না,—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি—মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন—তিনিই নাই,—তাঁর "আমি" আর খুঁজে পান না। বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না; যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা ছাড়ালে,—এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে? - সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বল্‌বে? একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে?

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ।—পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ, চুপ হয়ে যায়। তখন আমিরূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হয়ে যায়,—আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ করে তর্ক

করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও; তোমরা ভক্ত। সাকাররূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাক্‌লেই হলো। যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, সে ব্যক্তি অনন্ত শক্তি। ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।

সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষ কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনও ধরা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়,—আবার একদিন কিছুই হলো না। কর্ম্ম চাই, তবে দর্শন হয়।

এক দিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলাম। দেখি, একজন ছোট-লোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখছে। **যেন দেখালে,—পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না কর্‌লে ভক্তিলাভ হয় না,—ঈশ্বর দর্শন হয় না ধ্যান, জপ, এই সব কর্ম্ম; তাঁর নাম-গুণকীর্ত্তনও কর্ম্ম;—দান, যজ্ঞ, এই সবও কর্ম্ম।**

মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাত্‌তে হয়। তারপর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তারপর দই বস্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

মহিমাচরণ।—আজ্ঞা হাঁ, কর্ম্ম চাই বই কি। অনেক খাট্‌তে হয় লাভ হয়। পড়্‌তেই কত হয় অনন্ত শাস্ত্র!

শ্রীরামকৃষ্ণ।—শাস্ত্র কত প'ড়বে? শুধু বিচার ক'রলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর; তিনি কেমন, তিনিই জানিয়ে দিবেন।

বই প'ড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পৌছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর একরকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। আলু নাও—পয়সা দাও—স্পষ্ট শুনতে পাবে। সমুদ্র দূর হতে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্চে—দেখতে পাবে।

বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স—সব খড়-কুটো বোধ হয়।

বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না,—কাগজের খবর কি দিবে। কিন্তু যো সো ক'রে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক; তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম করবে।

একজন ভক্ত।—এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—**তাই কর্ম্ম চাই।** ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর—দেখা দাও বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো; তবে তাঁর জন্য একটু

পাগল হও। লোকে বলুক্, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।

যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে। হাঁগো, গিন্নিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতর সমুদ্রের ফেণা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি-বাঁধা শশা-বীচি, কুমড়ো-বীচি, লাউ-বীচি, এই সব রাখে। দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর—ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভের কথা। মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সে জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার ও আধেয় দুই।

মাষ্টার।—দয়াও কি একটা বন্ধন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজস্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁহুছিতে পারে না। চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয়—পাছে ধরা পড়ে। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণই চোর।

সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজো-গুণ সংসারে বদ্ধ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও

চোর,—তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না; তবে পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে "ঐ দেখ্, তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায়।" যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে। ব্রহ্ম কি, তাহা মুখে বলা যায় না। যার হয় সে খবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে—কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

ভক্তিপথ তোমাদের পথ; এ খুব ভাল—খুব সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম পেয়ে আমার দরকার—তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই; শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে—এ হিসাবে আমার কি দরকার? দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হোক, এ সাগরে পড়্‌তে পারলেই হ'ল। মনে কর, অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এ অমৃত একটু মুখে প'ড়লেই অমর হবে; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্,—একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন ক'রলেই তুমি অমর হবে।

অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে, ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামোটি যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-যোগ, আর ভক্তিযোগ।

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। নেতি—নেতি

বিচার করে।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। **কর্ম্মযোগ**—কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়ম্, ধ্যান-ধারণাদি কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ, এই কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

৩। **ভক্তিযোগ**—ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্ত্তন,—এই সব ক'রে তাঁ'তে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ উপায়। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। আমি আগেই বলেছি—সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম কর্‌তে বলেছেন, তার সময় কৈ? কলিতে আয়ু কম। তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বরলাভ না কর্‌লে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

আবার জ্ঞানযোগও এ-যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তার পর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহ-বুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী—বলে আমি সেই ব্রহ্ম; আমি শরীর নই; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ—এ সকলের পার।

যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে,

দর-দর ক'রে রক্ত পড়্‌ছে, খুব লাগ্‌ছে—অথচ বল্‌ছে, কৈ হাত ত কাটে নাই ;—আমার কি হয়েছে ?

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগই প্রশস্ত। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন

ভক্তিযোগ যুগ-ধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক যায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক যায়গায় যাবে। এর মানে—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ ক'রবেন। ভক্তবৎসল মনে ক'রলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলিকাতায় যদি কেউ একবার এসে প'ড়তে পারে, তাহলে গড়ের মাঠ, সুসাইটি, সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কলিকাতায় কেমন করে আসি ? জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপ-দর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়,—তখন অহং নাম রূপ থকে না। ভক্ত বলে, মা! সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। যে কর্ম্মে কামনা আছে, সে কর্ম্ম ক'রলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম করতে গেলে তোমায় ভুলে যাবো; তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন

পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম ক'মে যায়। যেটুকু কর্ম্ম থাক্‌বে, সেটুকু কর্ম্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো—নচেৎ নয়।"





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্যতা।

বৎস! কলিযুগে কেবল "জপা" আর "মাপা" এই দুই কর্ম্ম। সৎগুরুর আশ্রয় লও। গুরুর কৃপা না হ'লে কিছুই হবে না। সঞ্জীবনী শক্তি উন্নত আত্মা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র ও গায়ত্রী সর্ব্বদা "জপ" কর, এবং অহেতুকী ভক্তি দ্বারা সেই মন্ত্রের দেবতার চিত্র ও গুরুদেবের মূর্ত্তি নির্জ্জনে রাখিয়া, তথায় তাঁদের পূজা, জপ ও প্রণাম কর। আর মনে সরলতা ভাব রাখ, সাত্ত্বিক আহার কর, সাত্ত্বিক কর্ম্ম কর, যথাশক্তি মাপা অর্থাৎ দান কর। এসব করিলে আমায় লোকে খুব যশ করিবে, মান্য হবে,—ইত্যাদি ভাব একেবারে ত্যাগ কর। তাতে ভক্তি হয় না। তুমি একজন তৃণাদপি হীন ব্যক্তি—এরূপ মনে কর। "ভৃগুমুনির পদচিহ্ন ধারণে" আছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনায় সদা হরিঃ॥

যিনি তৃণ হইতে নীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানি লোককে মান দিতে পারেন, তিনিই হরি-সংকীর্ত্তনের যোগ্যপাত্র। শাস্ত্রে বিশ্বাস কর। ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হও—কাঁদো, তবে তাঁকে পাবে। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন,—

জলের ভিতর ডুবলে যেমন হাকুপাঁকু প্রাণ।
তেমনি ধারা হলে পরে মিল্‌বে ভগবান।

বৎস! "উৎসব" পত্রে এ বিষয় বেশ লিখিয়াছে; তাহা তোমায় জানাইবার জন্য বলিতেছি, শুন :—

"মন সদা অশান্ত, আত্মা সদা শান্ত। মন সর্ব্বদা সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া অশান্ত; আর আত্মা সর্ব্বদা সকল কার্য্যের সাক্ষীরূপে থাকেন বলিয়া শান্ত।

"যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে আমি জুড়াইতে চাই; আর জ্বলিতে পুড়িতে পারি না, আর ভাবিতে পারি না, আর ভুগিতে পারি না। আমি শান্তি চাই, আমি বিশ্রান্তি চাই"।

"সবাই আমরা শান্তি চাই। গানে বলে—শান্তি-নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল? তবে একটী শান্তি-নিকেতন আছে, যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত।

"কোথায় সেই শান্তি-নিকেতন? শ্রীভগবান্‌ই সেই শান্তি-নিকেতন। তাঁহাকে আশ্রয় কর—শান্তি পাইবে। স্মরণ রাখ—মনের সত্তা যাহা, তাহাই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ মন্ত্ররূপী হইয়াও মনকে মনন হইতে ত্রাণ করেন।

"কর্ম্ম না করিয়া মানুষ ত একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারে না; সঙ্কল্প বিকল্প না তুলিয়া মানুষের মন সজ্ঞান অবস্থায় এক দণ্ডও ত শান্ত হইয়া থাকিতে পারে না;—তবে শান্তি কিরূপে পাইবে? মন শান্ত না হইলে যদি শান্তি না পাওয়া যায়, আবার মনের স্বভাবই যখন হইতেছে সংসার-আড়ম্বর তোলা, তখন মন কিরূপে শান্ত হইবে?

"মন সর্ব্বদাই একটা-না-একটা লইয়া জ্বলিতেছে সত্য। ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প, আর বাহিরে স্থূলসঙ্কল্প পুঞ্জীকৃত হইয়া এই প্রকৃতির ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য! বাহিরের জগতের ঘটনাপুঞ্জ একদিন সঙ্কল্পই

ছিল; পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে ভিতরের বস্তু বাহিরে আসিয়া স্থূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ভিতরে বাহিরে প্রকৃতির নৃত্য; বল শান্তি এখানে কোথায়?

"কর্ম্ম তছাড়িতে পারি না। কর্ম্ম আজকালকার জগৎ ছাড়িতেও চায় না। কিন্তু শান্তিও চাই। কি হইবে?

"শ্রীগীতার শরণাপন্ন হও। শ্রীগীতা বলিতেছেন—কর্ম্মের ভিতরে একটি বিশ্রাম আছে,—অশান্তির মধ্যে একটি চিরশান্তি রহিয়াছে। তুমি যদি ইহা ধরিতে পার, তবে কর্ম্ম করিয়াও তুমি শান্ত থাকিতে পারিবে।

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ।" কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম শেষ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। এখন দেখ—অকর্ম্ম কি? অকর্ম্ম বলে তুষ্ণীম্ভাবকে। তুষ্ণীম্ভাবই বিশ্রাম। বিশ্রামই সন্তুষ্টভাব। ইহাই কর্ম্মশূন্য অবস্থা। ইহাই বিশ্রান্তি।

কিরূপে ইহা বুঝিব?

"একটু বিচার কর, বুঝিতে পারিবে। মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে। মনটি সূক্ষ্মপ্রকৃতি। আবার স্থূলপ্রকৃতি বাহিরে শত শত ঘটনা ঘটাইতেছে। এই দুই প্রকৃতি তোমার পশ্চাতে লাগিয়াছে, তাই তুমি জুড়াইতে পার না।

"কেন জুড়াইতে পার না—জান? তুমি ভাব, তুমি প্রকৃতির তাড়নাই পাইতেছ। কিন্তু যেখানে প্রকৃতি আছেন, সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তিনিকেতন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষ সদাই শান্ত; সেই পুরুষ—প্রকৃতির দ্রষ্টা; সেই পুরুষ সর্ব্বসাক্ষী। তিনি উদাসীনের মত প্রকৃতির কার্য্যমাত্র দেখেন। তুমি শুধু প্রকৃতিকে যতক্ষণ দেখিবে, ততক্ষণ তোমার সব ভুল হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরুষকে যদি দেখ,

তবে দেখিবে—প্রকৃতি এই পুরুষকে কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারেন না। প্রকৃতির সে শক্তি নাই। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং"—তিনি আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া আপন-গৌরবে সদা গৌরবান্বিত,—তিনি আপন গরবে আপনি বিরাজিত,—আপন শান্তিতে আপনি চিরশান্ত। তুমি এই দ্রষ্টা পুরুষের দিকে একবার চাহিতে শিক্ষা কর,—তুমি এই সর্ব্বসাক্ষী পুরুষের আশ্রয় একবার গ্রহণ কর; দেখিবে—প্রকৃতি আর তোমাকে অশান্ত করিতে পারিবে না।

"সহজ-ভাবে বল, কি করিয়া এই পুরুষকে দেখিব? প্রথমে মোটামুটি এই তত্ত্ব শুনিয়া **বিশ্বাস** কর—প্রতিকর্ম্মের মূলে এই অকর্ম্ম বা তুষ্ণীম্ভাব রহিয়াছে। মনের সত্তাটিই এই পরম শান্ত তুষ্ণীম্ভাব। ইহাই শ্রীভগবান্। চঞ্চল তরঙ্গের কোলে স্থিরসাগর রহিয়াছে। স্থিতি ভিন্ন গতির খেলিবার স্থান নাই। **বিশ্বাস রাখ**—পরমপুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তুর মধ্যে বিরাজিত।

"দ্বিতীয় কথা, যখন নিজে তাঁহাকে বুঝিতে পার না, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে শিক্ষা কর। শুধু প্রণাম করা অভ্যাস করিতে পারিবে না। তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভক্তকে উপদেশ করেন—মাং নমস্কুরু। তাঁহার নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রণব বীজ ও নাম লইয়া মন্ত্র। মনন হইতে ত্রাণ করেন বলিয়াই তিনি মন্ত্র। মন্ত্র জপ কর, আর প্রণাম অভ্যাস কর।

"মন্ত্রজপে সর্ব্বদা প্রণাম অভ্যাস কর। কোথায় তিনি নাই? এই আকাশ, এই বায়ু, এই পৃথিবী, এই জল, এই অগ্নি, এই অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলতা,—এই বিশ্বের যেখানে যা আছে,—শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত, সকলের মধ্যেই যখন তিনি আছেন, তখন সর্ব্বদা তাঁহার নাম লও, আর মনে মনে প্রণাম কর,—এই মূল সাধনা দ্বারা বিশ্বাসের

ধর্ম্ম ছাড়াইয়া ভক্তির ধর্ম্মে যাইতে পারিবে ; ক্রমে ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিবে।

"শাস্ত্রও বলেন, সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন। তুমিত ইহা মনে রাখিতে সকল সময়ে পার না। কতবার ভাবিয়াছ—মনে রাখিবে ; আবার কতবার ইহা ভুলিয়া গিয়া রাগদ্বেষের কাজ করিয়া ফেলিতেছ। তাই বলি, অল্পে অল্পে সাত্ত্বিক আহারটী অভ্যাস কর। কারণ শ্রুতি বলেন,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধাই ধ্রুবা স্মৃতি।" আবার নূতন করিয়া আরম্ভ কর। প্রথমেই তোমার উপাস্য দেবতার একটি মূর্ত্তি নিজের সাধনা-গৃহে রাখ ; রাখিয়া নিত্যক্রিয়া-অন্তে তাঁহাকে মন্ত্র জপ দ্বারা বহুক্ষণ প্রণাম অভ্যাস কর। বাহিরে যখন আসিবে, তখন যে বস্তু বা যে মনুষ্যকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে দেখিয়াই ভাবনা কর—"কোথায় তুমি?" "কোথায় তুমি প্রভু!" বলিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে থাক, আর মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রণাম করিতে থাক। মনে মনে প্রার্থনা কর –"বিশ্বাস করি তুমি সর্ব্বত্র আছ, কিন্তু দেখিতে ত পাই না। তাই নিরন্তর তোমার নাম লইতে চাই, আর তোমায় প্রণাম করিতে চাই। তুমি প্রসন্ন হও—হইয়া আমার গতি কর। হে প্রভু! আর আমি কিছুই চাই না ; তুমি প্রসন্ন হও—ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি যেন এক ক্ষণকালও তোমায় ভুলিয়া না থাকি। বায়ু যেমন একদণ্ডও আপন স্পন্দভাব ত্যাগ করে না, সেইরূপ আমিও যেন এক ক্ষণকালও তোমার নাম করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম করা বিস্মৃত না হই।"

"প্রণাম কর আর নাম কর, নিরন্তর কর। যাহা দেখ, তাহাই তিনি ভাবিয়া, সর্ব্বদা কর্ম্মটি লইয়া থাক। কর্ম্মে অকর্ম্ম—এই ভাবে অভ্যাস করিয়া চল। শুভ হইবে। শান্তি পাইবে।"

সমাপ্ত।

প্রাপ্তি-স্থান

"দৈনিক চন্দ্রিকা আফিস,"

১৪ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার,

কলিকাতা ;

ও

শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী

এথোড়া, সীতারামপুর